KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৫ ([illegible], কল-৬০
Collection : KLMLGK	Publisher : সুব্রত মুখোপাধ্যায়
Title : অন্তরীপ (Antareep)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No)	Year of Publication : NOV 1992 OCt 1993 Jun 1994 Jun 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : সুব্রত মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ

অক্টোবর ১৯৯৩

অন্তরীপ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ

অক্টোবর ১৯৯৩

ক্রম

৩-২৪ পুনর্মুদ্রণ : মণীন্দ্র গুপ্তের ২৫টি কবিতা

২৫-৩৪ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আবহমানের ভুবনে জহর সেনমজুমদার

৩৫-৪২ অলোকসামান্য অলোকরঞ্জন সুজিত সরকার

৪৩-৫১ ভাবুকের গদ্যচিন্তা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের গদ্য আদর্শ নিখিলেশ গুহ

৫২-৬২ অলোকরঞ্জনের একগুচ্ছ 'বিভাব' কবিতা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৬৩-৮৮ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দেবারতি মিত্র রণজিৎ দাশ জয় গোস্বামী ব্রত চক্রবর্তী সুবোধ সরকার অনিতা অগ্নিহোত্রী অমিতাভ গুপ্ত অজয় নাগ প্রমোদ বসু শুভ বসু নাসের হোসেন চৈতালী চট্টোপাধ্যায় তারাপদ আচার্য সুমন গুণ কৃষ্ণেন্দু চাকী শবরী ঘোষ বিজয় মাখাল দেবজ্যোতি রায় কাশীনাথ বসু দীপক রায় অজিত বাইরী রুদ্র পতি সন্দীপ্ত মাজি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় সুমন্ত মুখোপাধ্যায় কল্যাণ মিত্র সুব্রত সিন্‌হা অরণি বসু অর্ণব সাহা শ্যামলকান্তি মজুমদার শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

৮৯-১১৩ 'কবি ডুবে মরে; কবি ভেসে যায়' : জয় গোস্বামীর বাঁকবদল প্রবুদ্ধ বাগচী

১১৪-১২৫ সত্তর-এর কবিতার কয়েকটি বিশেষ ঝোঁক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১২৬-১৩৮ তাদেউশ রুজেভিচ-এর কবিতা : ভাষ্য ও ভাষান্তর ভাস্কর চক্রবর্তী

১৩৯-১৪৪ বোধের ভাষা, সময় ও তাবু-বিষয়ে প্রাথমিক কিছু লাজুক কথোপকথন চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদনা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রসঙ্গত

শ্রদ্ধাময় একগুচ্ছ পুনর্মুদ্রণ দিয়ে সূচনা হল এই সংখ্যার। নতুন নয়, শুধুমাত্র নতুন করে নির্বাচিত হল পাঁচটি গ্রন্থ থেকে আহৃত মণীন্দ্র গুপ্তের ২৫ টি কবিতা। আর এই পরিমিত পাণ্ডুলিপির সূত্রে ধরা রইল তাঁর বিচিত্রমুখী কবিতাকৃতি, তাঁর অনন্য অবলম্বন। এই মুহূর্তের কবিদের কাছেও এই প্রবীণ কবি কতখানি প্রেরণাসঞ্চারক, প্রত্যাশা রইল, এই নির্বাচন থেকে তা পুনর্বার প্রমাণিত হবে।

সেই পঞ্চাশ থেকে অদ্যাবধি কবিতায় ও গদ্যে যাঁর বিরল সব্যসাচিতা, সেই অলোক-রঞ্জনকে নিয়ে এই সংখ্যার দ্বিতীয় পর্যায় নিবেদিত। চারজনের কলমে তিনি ধরা দিয়েছেন তাঁর সামগ্রিক চালচিত্র নিয়ে।

উন্মেষ পর্ব থেকে তাঁর সাম্প্রতিকতম বই-এর প্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে মূল্যায়িত হলেন এই সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি জয় গোস্বামী। তরুণ প্রাবন্ধিকের আন্তরিক গদ্যে ছোঁয়া রইল তাঁর নিয়ত রূপান্তরের চিহ্ন, তাঁর অবিরল বিবর্তন আর বাঁকবদলের ধারাবাহিক ইতিহাস।

সাম্প্রতিকতম কবিতাগ্রন্থের নিরিখে আলোচিত হলেন সত্তরের বিশিষ্ট উজ্জ্বল কবি রণজিৎ দাশও। সপ্রতিভতায় ও বৈচিত্র্যে তিনি যে বাংলা কবিতায় অন্য মাত্রা সংযোজনের ক্ষমতা রাখেন, এ সত্যটাই প্রতিষ্ঠা পেল তাঁকে নিয়ে একটি অল্পায়ত মূল্যায়ন-সমীক্ষায়।

১১টি তর্জমায় ও ভাষ্যে নিবেদিত হলেন সাড়া-জাগানো পোলিশ কবি রুজেভিচ। অনুবাদ ঋদ্ধ হয়ে উঠল ষাটের স্বতন্ত্রতম কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর হাতে। সত্তরের কবিতার কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও প্রবণতা ব্যাখ্যাত হল নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের অন্যস্বাদ একটি নিবন্ধে।

এ-ছাড়া রইল শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু ৩৩টি কবিতাগুচ্ছ।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পুনর্মুদ্রণ ঃ মণীন্দ্র গুপ্তের ২৫টি কবিতা

অন্তহীন

বেল্টিংক স্ট্রিট দিয়ে দীর্ঘ-সারি ছাগলের দল প্রায়ই যায় ;
নিস্পৃহ পুথুলে জনযূথ আর পেছনের কসাই কি জানে—
কারা যায় ! কে চলেছে !
বিষণ্ণ স্তিমিত চক্ষু, নিষ্পাপ শিশুর মতো বুক,
অদৃশ্য ক্রসের ভারে ভগ্নজানু—কার দেহে পড়ছে চাবুক !

আমাদের সমস্ত পথ অন্তহীন ক্যালভেরির দিকে চলে গেছে।

'পিতা, ক্ষমা কর'—নিঃশব্দ গভীর আর্তনাদ শূন্যে উঠে
পাক খায়....

স্বপ্ন

বালকেরা স্বপ্ন দ্যাখে : জল, নৌকো, ভেসে চলে যাওয়া....।
আমিও পাটনীর নৌকো চুরি করে ক্ষণস্থায়ী এপার-ওপার
করেছি। অকূলে জলে নৌকো যে-রকম স্বপ্নে ভাসে :
ইচ্ছেমতো চলে যাওয়া, ইচ্ছেমতো বৈঠা রেখে চিত হয়ে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা,
ইচ্ছেমতো সন্ধ্যায় ডুবিয়ে নৌকো কারো পিছে পিছে
গ্রাম্য আঙিনায় গিয়ে মুখচোরা-দাঁড়ানো দীপালোকে
—এই সব জীবনে হল না। শুধু অনন্ত বিকেলে
আকাশে বেয়েছি নৌকো : ঢেউহীন কত বড় জল !—
বেপাত্তা গিয়েছি ভেসে অলীক সাগরে—দূর জলে....

সেই অবাস্তব জলে অঘোর রোদ্দুরে একদিন :
অসম্ভব ঢেউ ভাঙছে—জলফোয়ারার মধ্যে মায়াবী-মাধুরী এক দ্বীপ।
আমি সেই দ্বীপে যেন ভ্রাম্যমাণ,—মিষ্টি জল নেব ব'লে
ক্রমাগত বালি তুলে বালি খুঁড়ে পেয়েছি দ্বীপের যোনি। আর যেই
আঘাত করেছি সেই দ্বারে—ভিজে উঠল সরসতা—অকস্মাৎ

সৈকতের ত্বক যেন ছেয়ে গেল জৈব গন্ধে....বিস্তারিত নারীর আদল—
এ কি দ্বীপ ? শুয়ে আছো বিশাল মানবী !—তারপরই

নীল তিমি-র মতো তুমি ডুবছো আমাকে নিয়ে জলে....

চন্দ্রহাস

পায়ের নিচে টায়ার-সোলের চপ্পল খলবলিয়ে উঠছে,
চাষাড়ে জীন্‌সের মজবুত সেলাইয়ের মধ্যে
উদাসীন টাটকা উরু,
ভোরের বাতাসের জেট প্রপালশন
ঘাসফড়িঙের মতো আমাদের শরীরকে
সুকোমল তেজে বাঁকিয়ে দিচ্ছে !
আমরা জলে, অনলে, পর্বতে, শত্রুমধ্যে যে কোনো মুহূর্তে
উড়ে যাবার জন্য তৈরি।

কলেজ হস্টেলের এল. এস. ডি. খাওয়া প্রিয়ঙ্গুফুলের মতো মেয়েরা,
জাগো ! ভোরের স্রোত গাছের মধ্যে ঘুরে ঘুরে
অক্সিজেন মেখে আসছে—
জাগো !

গড়িয়ার আন্টুনি কবিয়াল, আর শ্যামবাজারের ভোলা ময়রা,
আজ সন্ধ্যায় আপনারা ধর্মতলার মোড়ে হাজির থাকবেন।
ঢাউস একখানা চাঁদ উঠবে আজ।

চাঁদ উঠলেই যানবাহন বন্ধ। তখন
তরজার একখানা দারুণ আসর বসবে—
আমরা পুরো শহরটাকে নিয়ে আসছি।
জাগো !

বাপের সুপুত্তুর নই বলে বাপমার মনে বড় দুঃখ—আমাদের
কেরানী বাপমা, শিক্ষক বাপমা, জেল ওয়ার্ডার বাপমা

কে ফেলেনি চোখের জল !
আজ, ক্যাপ্টেনকে ঘিরে ছেলেরা যেমন মাঠে নামে তেমনি করে
আমাদের দুঃখী মা-বাবাদের নিয়ে আসব আমরা—
আমাদের সবচেয়ে সুন্দর জামা তাদের পরিয়ে দিয়ে
হুর্‌রা বলে চেঁচিয়ে উঠব।
জাগো ! জাগো !

চন্দ্রোদয়

পশুপালন ও চাষ ছাড়া সমস্ত জীবিকাকে আমরা
পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দিয়েছি।
এখন আমাদের বুক, কোমর, বাহু ও জানুর মাপ
আদিম দেবদেবীদের মতো। আর
মন এত হালকা যেন প্যারাসুটে ভেসে
রোজ সায়াহ্নে নামি এই উপত্যকায়।

অনেক দিন আগে, প্রাচীন অশথের শুভ-অশুভ ডালপালায়
জড়িয়ে থাকত চন্দ্রবোড়া সাপের মতো মেঘ।
তবু পলকা সুতোয় মানুষ বেঁধে রেখে আসত তাদের কামনা
সেই গাছে।
মেঘের ফণা যখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠত তখন বুড়োরা দেখতে পেত
তার সবুজ চোখ।
করুণ খরগোশের মতো তাদের শিরদাঁড়ার বাঁকা রেখা অপেক্ষা করত
অতর্কিত ছোবলের জন্য....

আসলে বুড়োরা ভালোবাসত ভয় পেতে।
আজ যখন সে কথা তাদের বলি
তারা লাজুক শিশুর মতো হাসে।

এখন আমরা সেই দাদু-দিদাদের নিয়ে সেই অশথেরই ডালপালার ফাঁকে
নির্ঝরের মতো চন্দ্রোদয় দেখতে আসি—তারা আমাদের পুণ্ট জানতে

থাপ্পড় মেরে মেরে হাসে, কেবল হাসে।
পৃথিবীর শেষ খরগোশদের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে
আমাদের চোখে জল আসে।

আমি শিস দিয়ে বাজাই

আমি শিস দিয়ে বাজাই পাহাড়ী হাওয়া :
সুর এক ধাক্কায় ওঠে তিন হাজার মিটার গিরিশৃঙ্গে
যেখানে শুধু বরফ, আকাশ আর সূর্য ;
সটান লাফে গোত্তা খেয়ে নামে অতল খরস্রোতে
সেখানে অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গুমগুম শব্দে
প্রস্রবণ চাপ দেয় পাথরকে।

আমি শিস দিয়ে বাজাই পাহাড়ী হাওয়া :
হাওয়া ঘুরতে থাকে পাহাড়ের কোলে কোলে—
পাইনবনে মেঘ জড়িয়ে যায়, হঠাৎ শনশনিয়ে ওঠে বাতাস
নলখাগড়ার ঝোপ বুক চিরে ফেরাতে চায়
তার অনেক দিনের হারানো সুর।

নীল হিমেল রেণু কিংবা সাদা কুয়াশার জলছবি থেকে
একদল ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে আসে—তারা
টুপি উড়িয়ে খেলে, খাদের পাথর আঁকড়ে ঝোলে, লাফ দেয়,
দুড়দুড় করে নিচে নামে—
একঝাঁক কলহাসি নূপুরের মতো বাজতে বাজতে
খাদে-খোঁদলে গড়িয়ে যায়।

ছোট্ট পাখির মতো রোদ সারাদিন গাছগাছালি ঠুকরে ঠুকরে
পাখা মেলে শূন্যে ওড়ে শেষবেলায়
শিখরগুলো হঠাৎ ডেকে ওঠে—টি টি টি টি টি—ই
তারপরই
উপত্যকা থেকে মাথা তোলে ছায়া
ছায়া ছায়া ছায়া

আমি শিস দিয়ে বাজাই এই সব
পাহাড়ী হাওয়া।

এখন ওসব কথা থাক

এক লক্ষ বছর সঙ্গে থাকার পর সাব্যস্ত হবে, তুমি আমার কিনা।
ওসব কথা এখন থাক।
এখন চলো মিকির পাহাড়ে বুনো কুল পেকেছে,
চলো খেয়ে আসি।

লাল রুখু চুল
সূর্যাস্তের মধ্যে
আঁকড়ের উজ্জ্বল শিকড়ের মতো উড়ছে।
—দেখি দেখি, তোমার তামাটে মুখখানা দেখি !

সূর্য এখনি অস্ত যাবে। পশুর মতো ক্ষীণ শরীরে
আমরা হাঁটু পর্যন্ত জলস্রোত পেরিয়ে চলেছি—
জলস্রোত ক্রমশ তীব্র....কনকনে....

নৌকো

লাল স্কুলবাড়ির মধ্য দিয়ে নৌকো চলে গেল—
জলের গায়ে ক্রমশ বিপদের গন্ধ....

সমুদ্র ! সমুদ্র !
দিগন্বলয়ে জলোচ্ছ্বাস,
নিচে কুমারী পলাদের রক্তিম অশান্তি।
জল নয় যেন ইস্পাতের অসীম পাটাতনে রোদে পুড়তে থাকে দিন।
দশ ঘণ্টা এক অচেনা জলের উপরে মাল্লার খাটুনি।

বিকেলে, দূর মেঘমালার মধ্যে দেখি ভ্রম ঃ
আমাদের পাহাড়ী শহরে বাড়ির গায়ে আলো পড়েছে—
গির্জার চূড়ো....কার্পেট....পিকনিক....

চাঁদের আলো খাঁ খাঁ করে, অ্যাম্বারগ্রিসের কটু গন্ধ। গভীর রাত্রে
সরু মাস্তুলের ডগায় উড়ে এসে বসে মরা জলদস্যুর কঙ্কালমাথা—
ফরফর করে ওঠে, খরখর করে নামে, যেন শূলে চড়ে কৌতুক করছে
সেই নিষ্কর্মা বদমাশ।
জনমানবহীন দ্বীপের বালির উপর দিয়ে চাঁদের আলোয়
নৌকো ভেসে যায়।

আজ সাত শো বছর ধরে খাটছি, নোনা জলে, অক্টোপাস-হাঙ্গর-
চুনোপুঁটিদের সঙ্গে—
আমার কি মাছেদের মতো কানকো গজিয়ে গেল, নাকি গায়ে আঁশ ?
নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করি ঃ মনে আছে তোমার
গাছের কথা ? ছায়ার কথা ?

কদিন হল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আসছে।
ক্ষয়ে ক্ষয়ে এদিকে নৌকোটা তো একটা কুঁজো, খড়মড়ে হাড়ের পাশা—
আমার শুকনো দড়ির মতো পেশী আর কত সামলাবে !
যায় যাক, সমস্ত তলিয়ে যাক।

হাল ছাড়তে না ছাড়তেই দেখি সামনে একটা তিমিংগিল ঢেউ
পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে টলছে !

নৌকোটাই গুঁড়িয়ে গেল, নাকি আমিই চোখ বুজে দিয়েছি লাফ....?

তিমিংগিলের পিঠের ঢাল বয়ে পিছলে নামতেই দেখি ঃ
একেবারে অন্য দেশ !—
কোথায় জল ! কোথায় ডাঙা !
শুধু ধু ধু করছে
তুলুল হাওয়া হাওয়া হাওয়া।

গল্পগুলো

মণিকর্ণিকার দেশে বিকেল ফুরোয় না।—শুয়ে থাকে
শান্ত অনন্তনাগের মতো অপরাহ্ণ ভরে।
নেশাড়ু বুড়োর কাঁধে আচাভুয়া পাখি নেমে বলে ঃ
গপ্পো বলো—

জনহীন গোল চাতালের পিছে
পাহাড়ের মতো শূন্য উঁচুতে উঠেছে,
শূন্য সামনে নেমেছে খাদ হয়ে
নেশার বুদ্বুদ—বিড়বিড় ভাষার লহরী শোনা যায়—উদ্ভট শ্লোকের
ভাঙা সুর ঃ

উত্তরকুরুর বনে চমরী গরুরা নীল ঘাস থেকে
আকাশে লাফিয়ে ওঠে—
বৈকাল হ্রদের জলে ছায়া পড়ে নোমাডদলের।

একটা গল্প, শেয়ালের মতো মুখ গর্ত থেকে বার করতেই
গ্রামসুদ্ধ তেড়ে এল—মার, মার ! ধূর্ত, বদমাশ, হাঁড়িচোর !

আহীর গ্রামের ভরা যুবতীরা ঘড়া ভরে দুধ নিয়ে মিশে যাচ্ছে
দিগন্তরেখায়।

নিকটেই গাছের গম্ভীর ভাঙা দালানের ঘরে ঘন ছায়া—
একজন রাহী ঐখানে ফিরে এল সন্ধ্যেবেলা—রাত্রে এক মুশকিলআসান
তার আধখানা মুখে আলো ফেলে।

গোল চাতালের নিচে, দূর খাদে, দুইজন চোর
হিমরাত্রে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়েছে।

চাঁদনী রাতে স্কারটারিস পাহাড়ের ছায়া পড়ল
স্নেফেলের অনন্ত সাদায়।

দূর থেকে উদ্ভট শ্লোকের সুর শোনা যায় ঘুমের মতন।
গল্পগুলো পাখির ডিমের মতো ভাঙে....

একজন শিল্পসংগ্রাহকের অন্তিম

ধাতু এবং কাচ গালিয়ে তৈরি ঐ আঠারো সেন্টিমিটার মনুষ্যমুণ্ডটা
ম্যান্টেলপিসের উপর থেকে একচোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—
গুস্তাফ ভিগেল্যান্ডের এক পাগলা শিষ্যের ভয়ংকর মাস্টারপিস।
তার পাশে এবনি কাঠের নারীনিতম্বটি
যেন উগাণ্ডা-ব্যালের একটা প্রচণ্ড টুকরো।
একটু দূরে, ভাসা-কাঠ থেকে তৈরি নিঃসঙ্গ এস্‌কিমো পাখিটি।—
কয়েকজন মানুষের সারাৎসার আমার দখলে।
সংসারী বাড়িটি ভস্মীভূত করে গড়েছি পিরামিড।
আমিই তার মালিক এবং দাস।

শবাধারে যেমন শব
তেমনি ঐ শিল্পসামগ্রীতে বন্দী হয়ে আছে শিল্পীদের আত্মা।
আমি যখনি ঐ ধাতুপাথরকাঠখড়গুলিকে
ঘষে ঘষে পরিষ্কার করি, পালিশ তুলি
তখনি টের পাই আত্মাগুলো বলীয়ান হয়ে উঠছে—
তাদের তীব্র ঘ্রাণ ওঠে,
জলের নিচে ছায়ার সঞ্চারের মতো একটা ম্লান রঙ
ক্রমশ গাঢ় হয়ে ভেসে উঠতে থাকে।

সঙ্গহীন হয়ে ধীরে ধীরে ওরা আবার স্তিমিত হয়ে যায়—
আকাশের স্বাভাবিক গন্ধে ঘর তখন অনন্ত।

গতকালই সারা দুপুর ধরে ওদের পরিষ্কার করেছিলাম। ঘরে এখনো
ঝাঁঝালো আরক এবং ব্যান্ডেজের তীব্র গন্ধ।

সারাজীবনের অন্ত ঘনিষ্ঠতার শেষে আজ সন্ধ্যায়
অশরীরীরা উড়ে আসছে—
একলা বাড়ির রাত্রে, বিছানার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওরা—
ম্লান বেগুনি অন্ধকার....মুখচাপা হাসির মতো আরক্ত অন্ধকার....
অসম্ভব দৈহিক কষ্টে, শরীরের, এপার ওপারের সেলাই খুলে যেতে যেতে

ঝিলিক দিচ্ছে ছুঁচ :
কি ভয়ংকর পিরামিড এই শিল্পের জগৎ!

এখন মনে আসছে :
একদিন বৃষ্টিসম্ভব ঘন মেঘের নিচে
ডিম মুখে নিয়ে পিঁপড়েরা চলেছিল সার বেঁধে
পাখিরা দলে দলে চক্কর দিচ্ছিল আকাশে
মাটির রঙ নীলপিঙ্গল।
আরেক দিন পুটপাক গরমে
সোনালি সরীসৃপ নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল পাতার নিচে
বাঁশবনে ঘুরে ঘুরে পড়ছে পাতা।
এই সব দৃশ্য পবিত্র
কেননা এদের কোথাও আরম্ভ নেই, কোথাও শেষ নেই।
ঐ তো এই পিরামিডের জানলা থেকেও দেখা যাচ্ছে
শুক্ল তৃতীয়ার চাঁদ—
ঠিক যেন সাপের বিষদাঁত—সরু, উজ্জ্বল, অসমাপ্ত—
পিছনের কুণ্ডলীপাকানো শরীর মেঘে-অন্ধকারে অনেক দূরে পর্যন্ত অস্পষ্ট।
এ সব দৃশ্য এই রকমই—অস্পষ্ট, স্পষ্ট।
এই যেমন, সেই পিঁপড়েদের বিচক্ষণতা আর ততো স্পষ্ট নয়—
শুধু দেখতে পাচ্ছি
অপরিমেয় বিপদের নিচে চলেছে সাবধানী স্নেহের একটা দীর্ঘ লাইন।

শিল্পকে ধিক্।
এখন থেকে ঐ চলমানই আমার শেষ আশ্রয়।
হঠাৎ অন্ধকার ফেটে গেল—ভিতরে টান দিচ্ছে সিঁদুরে মেঘ
হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোড়ে ঢুকছে শুকনো বালি
হৃদয়ের কল্লোল শেষ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল—
একটু বাতাস!

বিরাট একটা পিঁপড়ে তার লক্ষ লক্ষ ডিম পায়ে দলে

আর্ত রাক্ষসের মতো বেঁকে যাচ্ছে শূন্যে—
শুধু একটু বাতাসের জন্য
শুধু একটু বাতাসের জন্য....

অদৃশ্য জগৎ

বেলা পড়ে আসছিল। পাখিরা গাছে ফিরে এসে একটু প্রাণখোলা চ্যাঁচামেচি
করে নিচ্ছিল ভাঁটির আলোর সঙ্গে। একসময়
তাদের গোল চোখ দেখে : জগৎ ধীরে ধীরে ছায়ার মধ্যে ঢুকছে।

অনেক দূর রোদ্দুর থেকে আমরা কজন মানুষ হেঁটে হেঁটে আসছি—
ন্যাংটেশ্বর, বসন্ত, আমি আর গোলাপ।
জটাজুট নিয়ে ন্যাংটেশ্বর যেন মেঘের থেকে নেমে এসেছে,
বসন্ত সাইক্লপের মতো তেঢেঙা লম্বা আর একচক্ষু,
হেঁটে হেঁটে গোলাপের পায়ের পাতা হাঁসের মতো অস্বাভাবিক, চ্যাপটা—
তবু এখনো তার মুখের রঙে মনুষ্যত্বের আঁচ একটু রয়ে গেছে,
এখনো তার কোমরের দড়িতে বাঁধা রয়েছে ছুরি।

ছায়া, শুয়োপোকার মতো চলেছে, ধীরে, উঁচুনিচু পথে ;
ছায়া, মথের মতো ডানা ছড়িয়ে, বসছে পাতার নিচে ;
তুলোর আঁশের মতো, ছায়া, উড়ছে বাতাসে। আমরা
আমাদের ভাষা পিছনে রেখে এসেছি—অন্য রকম করে
কারা ডাকল ? আমরা চারজন মুখোমুখি দাঁড়াই : কী অস্বাভাবিক
বুড়ো দেখাচ্ছে আমাদের !—মানুষের মতো না—গাছের গুঁড়ির মতো,
পাথরের মতো বুড়ো। এসব কী !

আমি ভয় পেতে পেতে থমকে গেলাম : একটু-মেয়েলি গোলাপ
বাজের গলায় হেসে উঠেছে। আর রাত্রি তার কালো কপাল ফাটিয়ে
রক্তের ফিনকিতে ভিজিয়ে দিতে লাগল আমাদের।

কয়েকজন কবি

ফোঁপরা এই পাহাড়ে আমরা কজন কবি থাকি,
এক-একজনের এক-একটি গর্ত।
হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠে কাঁচা বাতাসের নীল নীল স্তম্ভ,
তাদের মধ্যে ঢুকে সূর্যের কমলাহলুদ জটা
দীর্ঘপত্র ইকড় ঘাস হয়ে জন্ম নেয়—
তারা আসলে বহুদূরের খবর ধরবার অ্যান্টেনা।
সেই উঁচাইয়ে সেঁটে আছে এই মউচাক।

ভোরবেলা অনেক দূরে উড়ে গেলে টাহি নদী, কাঁচা বাঁশবন, তারপর
লোকালয়।
লোকালয় বড় জটিল পট। সারাদিন সেখানে
দশমহাবিদ্যার চলাফেরা। বিকেলে কা কা কা—কাকের পালকে নিয়ে
বিধবা ধূমাবতী আকাশে উড়ে গেলে
ভাঙা ভাঙা ছাইয়ের মতো অনেকক্ষণ তার চুল ভেসে থাকে
দিগন্তে।
তারপর সব অন্য রকম—ক্রমশ নিষুপ্তি—
ঘুমের ফাঁকে কোনো কোনো পাপী প্রয়োজনে বাইরে এলে দেখে
করাতের মতো চাঁদ উঠেছে : তার পাপের শাস্তি।

সাংঘাতিক কাঁসব ফুলের মধ্যে মধু !

আমরা কজন কবি, এই ফোঁপরা পাহাড়ে, বঁধিষ্ণু অন্ধকারে
পাগলের মতো ছাঁকি, জ্বাল দিই, ঘন করি কাথ—
অর্বাসিডিয়ন ছুরির সামনে শিথার মতো বসে থাকি, একা।

প্রথম মণীন্দ্রগুপ্ত

রাস্তায় চেনে না কেউ,
পথে মরলে বলবে, জনৈক অজ্ঞাতনামা লাশ,

কিন্তু এই দশনামী টং ঘরে, আমি রাজা,
প্রথম মণীন্দ্রগুপ্ত।

বহু মুষ্টিযুদ্ধ, বহু সাত তাল ভেদ, কুঠেদের গ্রামে বহু স্বয়ম্বর হেরে
শেষ জীবনে সিদ্ধমন্ত্র ঃ
শুধু এক স্তব্ধ সিংহাসন, আর একটি গোপন পতন—এই যন্ত্র!
এই নিয়ে অভ্যাস করি রাজাভাব।

প্রতিশোধ নিতে এসে ছদ্মবেশী রক্তমুণ্ড নাগ, কোন পূর্বসখা কুকুর ক্ষত্রিয়
সভয়ে সামনে দ্যাখে, মণিহীন আমার দু চোখ সাদা
ঠাণ্ডা স্ফটিকের মতো ;
চোল অবরোধ থেকে কামার্তা উড্ডীন বিদ্যাধরী
কলকাতার অপরাহ্নে অজন্তার গুহার আঁধার হয়ে আসে—
আমি শুধু ভস্মচোখে চাই।—মুহূর্ত, অনন্ত সব ছাই।
এই রাজযোগ—এই আমার হিংস্র মোক্ষপথ।

কিন্তু রাত্রিবেলা চাঁদ ওঠে।
চাঁদের ওপিঠ থেকে দুঃসাহসী ছোট্ট শুক
হাতের পাতায় বসে ছায়াজগতের কথা বলে ঃ
এখনো রানীর অন্ধকার কাঁধে নাকি জ্বলে
তীক্ষ্ণ অতীত আঁকড়।
পৃথিবীতে যত ফুল ফুটেছিল সব চলে গেছে সেই দেশে।
প্রেতবর্ষে ঢুকে যায় মৌমাছিরা।
আমি জ্যোৎস্নালোকে ঢুলে ঢুলে সেই পথে
পুনর্জন্মে নামি।

দুঃখের শেষে

লোকটার সঙ্গে দেখা হল সদর স্ট্রিটে। সে তখন
একদঙ্গল সমকামী আর হিজড়ের মণ্ডলীর মধ্যিখানে নেচে নেচে
বাঁশি বাজিয়ে শোনাচ্ছিল।

শীতের রাত্রে বাঁশির স্বরে চাঁদ থেকে সুতো বেরিয়ে বেরিয়ে
দঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে ফুরফুর করে ওড়ে—যেন ইচ্ছে করলেই
লাফিয়ে উঠে এক খাবলা ছিঁড়ে নেওয়া যায়!

লোকটার পরনে জিন্‌স না পাজামা, তেমন নজরে আসে না, কেননা
নাচের দমকে ফুলে ওঠা তার খয়েরি চাদরখানা
কাঁধের উপরে তখন প্যারাবোলার বিশাল ডানা। চাঁদের বিপরীতে
একটা অত লম্বা মানুষের কাঁধে সেই অন্ধকার গরুডানা দেখে
ভয়ে বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।

স্বভাবভীরু সমকামীরা সমবেত-ভয়ে ঘুৎকার করছিল। কিন্তু
হিজড়েরা অসাধারণ সাহসী এবং
বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখায় থাকে বলে এইসব গভীর
সম্ভালনের মর্ম বুঝতে পারে।
কর্কশ খুনীর মতো গলায় তারা সমকামীদের ধমক দিয়ে থামিয়ে
নরম, অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে—যেন যবনিকার
আড়ালে দেখতে পেয়েছে নাটক ঃ
জন্মদুঃখী শিশুর দল জাদুকরের সঙ্গে চলেছে
সবুজ, অফুরন্ত বনের মধ্যে দিয়ে।

সংগ্রহ

শুরু হয়েছিল ডাকটিকিট দিয়ে—
তারপর দেশলাইয়ের বাক্স, মুদ্রা, মুখোশ, প্রজাপতি, নুড়ি,
অবশেষে চাঁদের পাথর।
কিন্তু এসব হচ্ছে দুগ্ধপায়ী শিশুর যোগ্য—
অতএব, তারপরই আমার লক্ষ্য হল সাবালক পুরুষালি বস্তু।
এবং বলতে পারি, এখন আমার সগর্ব সংগ্রহে আছে
ইয়োরোপীয় সতীদের ব্যবহৃত গুটি পঞ্চাশেক চেস্টিটি বেল্ট,
জ্যান্ত অবস্থায় ছাড়ানো রেড ইন্ডিয়ান যোদ্ধার
বিনুনি ও ঝুঁটি সুদ্ধ মাথার কিছু চামড়া,
নাগা ও বোর্নিওর নরমুণ্ডশিকারীর খুনী দা,

বাঙালি আত্মঘাতিনীর ফাঁসুড়ে শাড়ি (তার মধ্যে দুখানা বালুচরী),
মাউরি সুন্দরীর উল্কি-আঁকা পিঠের ও তলপেটের ছাল,
পারমাণবিক যুদ্ধ-পরবর্তী কালো পাঁত এবং সাদা রঙের মানবভ্রূণ, বিভিন্ন
পর্যায়ের।

বর্তমানে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি
সমাধিস্থ সাধুর মস্তিষ্ক, এবং
চৌকো গর্তে খাপে খাপে লেগে যায় এমন একটি গোল দণ্ড
বা ভাইসি ভার্সা।

একটি কাল্পনিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে

অবাক হলাম তরুণ কবিটিকে দেখে। তাঁর শরীর, তাঁর সঞ্চলন, তাঁর পরিমণ্ডল, অর্থাৎ তাঁর যা কিছু সবই যেন স্বল্প, সূক্ষ্ম, পাতলা ও হালকা। তাঁর হাত, পা ও পাঁজরের হাড় শরবৎ চুষবার স্ট্র দিয়ে তৈরি। তাঁর ছোট্ট শীর্ণ শরীরটিকে সেদ্ধ করলে পাওয়া যাবে রোগীর পথ্য ট্যালটেলে ঝোল, এবং তারপর থালায় পড়ে থাকবে মানুষের শিরদাঁড়ার বদলে সিঙ্গিমাছের চিরণ কাঁটা। তাঁর চোখ ও ঠোঁট যেন মরা ঝিঁঝির পাখা ও পিঠ। তাঁর মুণ্ডের চুল ও তুণ্ডের চারদিকের রোম উসুখুসু হাওয়ায় ভাসা শিরীষফুলের মতো হালকা এবং মৃদুগন্ধ। তাঁর পায়ের চার নম্বর চটিজোড়া হল সিণ্ডারেলার জুতো।

স্নেহবশে, আমার কেবলি লোভ হচ্ছিল, তাঁকে টুপিতে তুলে নিয়ে উপহার দিই পাশে বসা সুন্দরী আমাজন মহিলাটিকে।

কিন্তু সেই কবি স্বরচিত কবিতা শুরু করতেই আমি হতভম্ব! আগম নিগম তন্ত্র ভূবিদ্যা কিমিয়া নৃতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব কি নেই তাতে! কি গুরুভার তাঁর বাক্য!—এক একটি শব্দের ওজন যেন এক এক কুইন্টাল! এবং সর্বোপরি তাঁর ভাষা ও অন্বয়—ভাটপাড়া, ফোর্ট উইলিয়ম ও গুহ্য সাধন প্রণালীর যোগসাজসে তৈরি এক ষড়যন্ত্র।

আমি তাঁকে ভেবেছিলাম ছোট্ট আর হালকা। এখন দেখছি তিনি বেজায় ভারী দৈত্যাকার নভশ্চরের পোশাকের মধ্যে বসে দুহাতে পাথর ছুঁড়ে আমাকে শুইয়ে ফেলছেন।

বাড়ি

আমি পারি নি। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকটি পরিবার বাড়ি তৈরি কর—
আনন্দময় বাড়ি।
আমি প্রত্যেকের জন্য আলাদা প্ল্যান করে দেব,
নিজে দেখাশোনা করে বানিয়ে দেব।
গোনাগুনতি খোলা সিঁড়ি ছাদে উঠে গেছে এমনভাবে যেন শিশুরা
মনে করবে তারা আকাশে উঠছে। বাজপাখি দুপুর-মৌতাতে
পাহাড়চূড়া ভেবে জলের ট্যাংকে এসে বসবে। আবার ঝড়ের মধ্যে
মনে হবে, কংক্রিটের এক বেঁটে পালোয়ান চার-হাত-পায়ে
উবু হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কিছুতেই তাকে চিত
করতে পারছে না।
ফার্নিচারও আমি ডিজাইন করে দেব, আপহোলস্ট্রি পছন্দ করে
দেব।
ধূসর-সবুজ জলের মধ্যে তন্বঙ্গী সরলপাঁটি যেমন ঝিকমিক করে
তেমনি, ছায়াচ্ছন্ন ঘরে তোমাদের কিশোরী মেয়েটিকে মাঝে মাঝে
দেখা যায়—কাজ করছে, বই পড়ছে। দিনশেষে বাড়ি ফিরে
নিজের কৌচটিতে বসে বলিষ্ঠ রুইমাছের মতো তুমি শান্তি
পেতে পেতে দেখবে, মৃদু আলোয় তোমার চারপাশে
জলজ কুসুমেরা দুলছে।
আমার নিজের বাড়ি কেমন হবে সে কথা ভাববার সময়
আজ পেরিয়ে গেছে।

অশ্রু

পাখির মরণ যখন ঘনিয়ে আসে
তখন তার ডাকের মধ্যেও ব্যথা ফুটে ওঠে।
মাঠের কাকতাড়ুয়ারাও তা বোঝে, সারা রাত তাদের হাঁড়িমাথায়
শিশির পড়ে পড়ে ভোরবেলায় চোখ ভিজে উঠেছে।
হেমন্তের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে তারা দ্যাখে—কৃষক আসছে,
গোরু আসছে। ওদের চুনে আঁকা চোখ কি শেষ পর্যন্ত

আমার জ্যান্ত চোখের চেয়েও অনুভূতিপ্রবণ হল !
আমার কেউ আসেও না, যায়ও না।
রাত্রে গোরের থেকে যারা ওঠে তাদের কান্না কে শুনেছে !
যাবার আগে, আমার শেষ সান্ধ্যভোজের শক্ত পাঁউরুটিটুকু
অন্তত যাতে ভেজে,
আমি সেইটুকু চোখের জলের অপেক্ষায় আছি।

তিব্বতী

আকাশে তারাগুলি পশু, যোদ্ধা, মহাপুরুষের মতো দীপ্যমান।
মালভূমিতে খোলা জায়গায়
শুকনো রডোডেনড্রনের কাঠকুটো জ্বালিয়ে রাত্রে রান্না হয়।
রডোডেনড্রনের ডাল রাঁধতে রাঁধতেও ফুল ফোটায়।
পশু থেকে যোদ্ধা, যোদ্ধা থেকে মহাপুরুষ হতে
তারাদের ক' কোটি বছর লেগেছে—আমি শীতরাত্রে
খোলা মাঠে শুয়ে ভাবি।
বন্ধু কুকুর লোমশ থাবায় মুখ গুঁজে
আমার শরীর ঢেকে বুকের উপর শুয়ে থাকে।

এই মালভূমি, এই তুষারপাত,
এই আকাশ, এই তারা,
এই-ই বোধ হয় বোধিসত্ত্বের জীবন।

কুকুরের গাঢ় নিঃশ্বাসের মধ্যে আমার স্বপ্ন ঢুকে ঘুরে বেড়ায়
যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে চিমনি পরানো লণ্ঠনের আলো নিয়ে
কেউ পথ খুঁজছে।

শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু

মুক্তাঞ্চলের পতাকা কেমন হবে চিন্তা করি।
যামিনী রায় নাকি পুলিশের উর্দির রং আর ছাঁটকাট নিয়ে ভাবতেন।
এসব ছোটোখাটো জিনিসে অবহেলা করা ঠিক না—বোঝা উচিত
একটা ভুল রঙের ছোপ পুরো ছবিটাকেই অশান্ত করে দিতে পারে।

ছেলেবেলা থেকে ভেবেছি উপকরণহীন জীবন আর পূর্ণ আত্মনির্ভরতার কথা।
কিন্তু দিওজিনিস ও তাঁর গামলার কল্পনা আমার কাছে অমানুষিক লাগে।
শরতের মেঘ আর কাশফুলের চেয়ে বেশি ভারী কোনো কিছুর সঙ্গে
আমি আর জড়িয়ে পড়তে চাই না।

অতএব, আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করি তাঁবু, দড়ি, ছুরি, হ্যামক,
জলের বোতল, রন্ধনপাত্র আর কম্বলের কথা—
চেষ্টা করি ওদের ওজন কমাতে, কার্যকারিতা বাড়াতে,
কি করে নকশায় আরো সারল্য আনা যায়।
শীতে আর বর্ষায় ক্যাম্পিং শেখাতে পারে এমন জন্তুদের খোঁজে বেরোই।
রমতা সাধু, বেদে আর জলার পাখিদের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম খুঁটিয়ে দেখি।
ভাবি, কত কমে চালানো যায়, কত হালকাভাবে চলা যায়।
গা থেকে রঙিন পালক, বাড়তি পালক ঝেড়ে ফেলি
কেননা আমি যে উঁচুতে যাব সেখানে এখনো কোনো পাখি ওড়ে নি,
শরীরের সব কাঁটা আর শল্ক উপড়ে ফেলি
কেননা আমাকে এক চুলচেরা ফাটলের ফাঁক দিয়ে এমন এক দেশে যেতে হবে
যেখানে কোনো সরীসৃপ পৌঁছয় নি।

সন্তান

আমাদের প্রথম সন্তান ছিল বায়সজাতীয়।
প্রত্যহ, অন্য ছেলেপুলেদের নিয়ে যখন আমরা
বিছানায় ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই কাকভোরেই সে
হুস করে বেরিয়ে যেত।
তারপর সে ফসল ওঠা মাঠ আর জলাভূমির দিগবলয়ে
চক্কর মেরে ঘুরত সারা দিন। কখনো কাটা ঘুড়ির মতো
দুলতে দুলতে গিয়ে পড়ত খেচরদের ঝগড়া-কাজিয়ার মধ্যে।
ভাইবোনেরা খেয়েদেয়ে ইস্কুলে গেলে মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে
ডাকে—আয় আয় আয়রে আমার পাখি।
আগে সে মায়ের ডাকে ফিরে আসত। আজকাল আর

আসে না। ঝরা মরা পচা খেয়ে যে দিন কাটাতে পারে
মাতৃস্নেহে তার কী দরকার!
অগত্যা, তাকে ধরবার জন্যে ভাইবোনেরা ঝোপে ফাঁদ পেতে রাখে,
বিকেলবেলা কার্নিসের কাছে কাগমারদের আঠা মাখানো
লম্বা আঁকশি নিয়ে লুকিয়ে এগোয়।

আমাদের সেই পত্র রাত্রি, রাত্রিকালীর অন্ধকার সমুদ্র, এবং
শেষে মৃত্যুর স্বরূপে উপলব্ধি ক'রে কাকজ্যোৎস্নায়
একবার ডাকে : মা। ডেকে ওঠে : মা!

সামুদ্রিক

নৌবিদ্যার এই বইটা অনেক হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে।
যারা এটা পড়েছিল তাদের আঙুলের রহস্যময় ছাপ রয়ে গেছে এর পাতায় :
তামাকের গন্ধ, আফিমের দাগ, মার্জিনে সাংকেতিক নোট, অশ্লীল কথা—
লোকগুলো যেন চোখ খুলে কোনো কোনো পৃষ্ঠা এখনো পড়ছে,
নেশায় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।
একটা পাতায় কেউ দোয়াত উলটে কালি ঢেলে দিয়েছিল—
নীলে লেপা পাতার মধ্যিখানে একটুখানি পাঠোদ্ধার করা যায় :
ম্যান ওভারবোর্ড!
হঠাৎ কালোনীল জলের তলায় ডুবে গেল লোকটা কে?

রোজ রাত্রে বই খুলে বসি। ঘুমে ঢুলি। কিন্তু টের পাই
সেই লোকটা সমুদ্রজল থেকে হাত বার করে পাতা উলটে দিচ্ছে।

টেবিলের উপর পড়ে থাকতে থাকতে বইটা সহসা নিশ্বাস ছাড়ে,
অদ্ভুত শব্দ করে, যেন জাহাজের এঞ্জিন চালু হয়েছে।....
লাস্টারি লাইনারটি যেন বিশাল রোমান প্রাসাদ। তার
প্রায়ান্ধকার দীর্ঘ স্তম্ভবীথিকায় বসে থাকা নিদ্রাহীন কালিগুলোকে নিয়ে
সেই প্রাসাদ যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে ডুবছে।
প্রথম-পঞ্চাশ বাঁওয়ের মধ্যেই ভোরের সূর্যের লোহিত-হলুদ আলো

দ্রুত নিভে গেল, ক্রমশ সবুজ রংটিও গাঢ় হতে হতে ঘন নীল হল।
তারপরের দেড়শ ফ্যাদম গাঢ় কালির মধ্যে
শেষ বেগুনিটুকু একটু-বা নড়েচড়ে।
তারপর শুধু অন্ধকার—চির অন্ধকার।
কালিগুলোর আতঙ্কের স্বর আর শিকারী কুকুরদের ডাকের মধ্যে
ছায়াহীন জলজন্তুরা নিঃশব্দে আসে, আবার
নিঃশব্দে চলে যায়।

পরিব্যাপ্তি

একটু টিপে, বার কয়েক গন্ধ শুঁকে
বুনো টুকটুকে আমটিকে
যেমন দোকানীর ডালায় আবার নামিয়ে রেখে
চলে যায় খদ্দের, তেমনি করে ওরা
আমার মেয়েকে বার বার অপছন্দ করে গেছে।

তারপর থেকে, দুপুরে, নিঃঝুম এক ঝাঁকড়া বটগাছের নিচে
মেয়েটা স্বপ্নাচ্ছন্ন উন্মাদিনীর মতো
চুল এলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।
গভীর রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে
সেই গাছের গায়ের সঙ্গে লেপটে অন্ধকারে মিলিয়ে থাকে।
বলে, ঐ গাছ তার বর।
আর সেই থেকে আমাদের বংশটাই অদ্ভুতভাবে বদলে গেল।
মারা যাবার পর আমি ঐ মেয়ের গর্ভে জন্মালাম।
মেয়ে আমার মা, বটগাছ আমার বাবা।

পেটে ফল ধরতেই মা স্রোতের মতো আপন মনে মনের কথা বলে
আর পৃথিবীর সুখদুঃখআলোবাতাসে গর্ভের জল দুলে দুলে ওঠে।
এইভাবে মা আমার মন তৈরি করল, ধীরে, গোপনে।
কিন্তু জন্মের পরই বোঝা গেল, আমি বাপের ছেলে—
আমার মধ্যে গাছের শক্তি : আমি নিঃশব্দে হেসে খুন হই,
বেপরোয়া ঝিম মেরে থাকি, বিভীষিকা দেখাই।

এখন আর আমার হাত পা কাটলে রক্ত পড়ে না,
মাথা ফাটালে ঘিলু বেরোয় না।

মাংস ও কাঠের মাঝখানে কী হওয়া যায়
এই ভেবে আমার মধ্যে মর্মর শব্দ ওঠে।

পাতা ঝরা

দূরে বিদেশের লাল মেপল পাতার ঝড় চিঠিতে ভরে
পাঠিয়ে দিয়েছ। যেন কিছু ডলার, যেন কিছু
উইনসর নিউটনের রং—যার জন্যে অনেকদিন
তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি—যেন তার চেয়েও দামী॥

কৌটোর ভিতর পোকা পুষলেও তাকে সময়ে
খাওয়াতে হয়। আর তুমি কি রকম মা,
পেটের মধ্যে বাচ্চা রেখে তাকে বিয়োতেই ভুলে গেলে!
তোমার পেটের মধ্যে ফুলের গাছটি বেয়ে
তোমার থেলিডোমাইড খোকা বার বার ওঠে
আর পিছলে পিছলে পড়ে। তার বিকট মাথার মধ্যে
সেই তৈলাক্ত বাঁশ আর বাঁদরের অঙ্কের অসমাধান
আর ভয় কাজ করে।
এসব কি তুমি একেবারেই টের পাও নি?

বেলাশেষের নিচু আকাশে লাল মেপলের পতঝর।
এখন মন আর শরীরের সঙ্গে থাকতে চায় না।
বিদেশের ষণ্ঠীতলায় দাই-মেট্রনের কাছে শেষে তুমি—
কুকুর যেমন নৈবেদ্য উগরে দেয় সেইভাবে—
ওকে নামিয়ে রেখে চলে গেলে।

আমিও কালো খুদে ক্রীতদাসটির বদলে কিছু বিদেশী মুদ্রা
পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা দেখি। কে বলতে পারে,
হয়তো এইভাবেই হারাতে হারাতে কোথাও আমাদের
বংশধারা টিকে থাকবে।

যা হয় না তাই

আকাশে টিয়াপাখির ঝাঁক ধানখেতের সবুজ বাতাসের মতো উড়ে চলেছে;
নিচে বনের মধ্যে লোভী করগারি কুকুরের পাল
লাল আগুনের মতো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে;
মধ্যিখানে আকাশের নীল নকশার কাগজ কী ফিনফিনে আর
অন্তহীন!—বাতাস লেগে ফিসফিসিয়ে ওঠে, কিন্তু ছেঁড়ে না।

আমি এই ঘরের কোণে বসে এই মুহূর্তে ভাবছি—এতদিন
নিজের শার্ট-প্যান্ট নিজেই কেচেছি—কিন্তু কয়েক খেপ পরে
আর পারব না। তখন কি হবে!
বইগুলোর ধুলো ঝাড়তে এখন হাঁক ধরে। এর পর কি হবে:
ছাদে উঠতে কষ্ট হবে!
দুপুরের ঘুঘুর ডাকে কষ্ট হবে।
জানলা দিয়ে হেমন্তের ম্লানতা ঢুকলে কষ্ট হবে।
অথচ টিয়া আর করগারিদের সঙ্গে আমার একদিন ভাব ছিল।
আরও অনেকের সঙ্গে ভাব ছিল।
এই বন্ধুত্বের টানে জলপাই বনের দোয়েল
আংকোর ভাটের কুঠে রাজার কাঁধে গিয়ে উড়ে বসে,
সমুদ্রে ডুব দেবার আগে অস্তসূর্য এঞ্জিনঘরে রাত-জাগতে-যাওয়া
দগ্ধমুখ মাল্লাটির পিঠে হাত রাখে।
এইভাবে আমারও ছিটেফোঁটা হয়তো বৃষ্টির জলের সঙ্গে, হয়তো
নিঃশ্বাসের বাষ্পের সঙ্গে বা কফিনের কর্পূরের গন্ধের সঙ্গে
কোথাও থেকে যাবে—
এইসব যখন ভাবছি
হঠাৎ তখন সুবাতাস এসে, কুঁচকোনো বেলুনের মতো আমাকে,
ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে, উড়িয়ে নিয়ে চলল শূন্যে—ইহকাল পরকাল
যেখানে কোটি কোটি রঙিন টুকরো কাগজের মতো উড়ছে
তারও বাইরে।

আমার শেষ কবিতার বই

আমার এই বইটির প্রথম দশটি কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
তারপর সেগুলির পুনর্মুদ্রণ ঘটে প্রবাসীতে, কষ্টিপাথর বিভাগে।
সেই সময়েই শাহেদ সারওয়ার্দি আর অপূর্ব চন্দের সঙ্গে
এই কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের।

পরবর্তী পনেরটি কবিতা প্রকাশিত হয় গত দশকে
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে। কিন্তু
অন্নদাশংকর রায় জানাচ্ছেন, তিনি ঐ পনেরখানাই
তাঁর যৌবনে অনুবাদ করেছিলেন ওড়িয়াতে।
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডীন জানিয়েছেন,
ওগুলো নাকি ভাই বীর সিংয়ের অনুবাদে
অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে গুরুমুখীতে।
যেদিন রাত্রে কুমারী অরু দত্ত
ঐ কবিতাগুচ্ছের ফরাসী ভাষান্তর পেলেন
সেদিন প্যারিসের সমস্ত বাগানে ফুলেদের আর ঘুম এল না।

বারোক গির্জার দেয়ালে, আর হাম্মুরাবির কোড-এর ফলকে
এই বইটির ২৬ সংখ্যক কবিতা
বাণমুখ লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে।

তাহলে এই কবিতাবলির জন্মউৎস কত দূর অতীতে?
মনে হয়, কূর্মাবতারের শক্ত খোলার পিঠে
প্রলয়সমুদ্রের অন্ধকার নিশীথ জল আর
ফসফরাস আর বালি
অতি ধীর লয়ে
এখনো খোদাই করে চলছে
৬৮ সংখ্যক কবিতা,
যা বইটির শেষ কবিতা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আবহমানের ভুবনে

জহর সেনমজুমদার

১. প্রসন্নতার বোধিবিন্দু
২. রক্তক্ষরণের মর্ত্যবিন্দু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাকে, এইভাবে, দুটি পর্বে বিভক্ত করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, একজন কবির তৎসহ মানবের আবেগ ও মননের গভীর রূপান্তর। প্রসন্নতার বোধিবিন্দুজাত প্রথম পর্বের কবিতা থেকে আত্মউন্মোচিত রক্তক্ষরণের মর্ত্যবিন্দুনির্ভর কবিতার দিকে যে অলোকরঞ্জন হেঁটেছেন, তিনি আমাদের বিশেষ অর্থে স্মরণ করিয়ে দেন জাঁ ককতোর সেই প্রবাদউক্তি : 'আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সেই মানুষ, যে হাঁটে, আর তার হাঁটার ভঙ্গি।' শুধুমাত্র মানুষই নয়, কবিতাও যে হেঁটে যায় এক প্রান্তের দর্শন থেকে অন্য প্রান্তের অভিষিক্ত চৈতন্যে, তারই মহৎ প্রমাণ অলোকরঞ্জনের কবিতা। তা নয়তো সেই স্থবিরতাই কবিকে গ্রাস করে, যা কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠবার পথে কবিসত্তার রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়ায়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থের 'নামখোদাই' কবিতাটির প্রতি মন দেওয়া সম্ভব :

'...এই যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী
আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,
এখানে গত একুশে আশ্বিন
শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন
বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথিলাম
ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম।'

বাটালি দিয়ে আমরা অনেকেই এইভাবে নাম খোদাই করি, চিরজীবিতের দলে পৌঁছোবার গভীর আকুতিতে। কিন্তু এই নাম খোদাই থাকে না, দ্রুত মুছে যায়; কারণ এ-হেন নামবপন করবার মধ্যে নেই প্রাণের সংসর্গ তৈরি করবার বা মহা-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাবার ব্যাপকতা। গভীর মর্মে তাই দ্রুত মর্মর উঠলো। বদ্‌লে গেলো জীবনযোগের অন্তঃসারশূন্য মানসিকতা। নাম মুছে গেছে বলে ক্রুদ্ধ হলেন না তিনি। বরং অন্তর্গত প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়ালেন নিঃশব্দ অস্তিত্ব নিয়ে, সাঁওতালদের মাঝে, মাদলের সম্মিলিত ছন্দময় ধ্বনির মাঝে;

এবার প্রসন্ন উৎসাহে নামখোদাই করলেন সাঁওতাল ও মাদলের আভ্যন্তরীণ যৌথ হৃদয়প্রবাহের ভিতর। লিখলেন—'তাদের বুকে এ-নাম বুনে বলেছি : ভুলবি নে।' এইভাবেই তিনি মহাজীবনের অন্তর্গত হলেন কিম্বা মহাজীবনও রূপ-রস-ধ্বনি নিয়ে তাঁর অন্তর্গত হলো, চিহ্নিত হলেন তিনি মিশে যাবার অন্তরঙ্গে। চিহ্নিত হলো আত্মবিস্তারে জীবনসংরাগী হয়ে উঠবার নিজস্ব প্রবণতা। জীবন-সংরাগ থেকেই 'যৌবনবাউল' পর্যায়ে আঁকড়ে ধরলেন মা এবং ঈশ্বরকে। প্রথম মূর্তিটি রচিত হলো প্রাত্যহিক দেখার মাধ্যমে। দ্বিতীয় মূর্তিটি রচিত হলো দেশজ শিকড়ের আল্পনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। মাতৃমূর্তির মধ্যে জাগ্রত হলো পূর্ণিমার সহস্র ধারা, উদ্ভাসিত উষা, অতন্দ্রিত পদ্মবীজমালা, ধ্রুববতী আনন্দ, উজানী উল্লাস এবং বোধিবৃক্ষমূলের জীবন্ময়ী আনন্দপ্রতিমার রূপ। দ্রষ্টব্য 'মায়ের জন্মদিনে' কবিতাটি, যেখানে তিনি বলছেন :

'....আমারি জীবনমন্ত্রে জীবন্মৃত এই যে প্রান্তর
সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলার ফুল্ল সুষমায়
কাল যদি ভরে ওঠে, তবে তার নিহিত ভাস্বর
যে-অমৃত সে তো তুমি, আজো যার অপার ক্ষমায়
পৃথিবীকে বুকে টানি।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মা-কে ভালোবাসার তীব্র উৎসমূলে থেকে তাঁর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে সর্বমানবযোগের অভীপ্সা। দরিদ্রধ্বংসের ধানক্ষেতে তাঁর চোখে আটকে যায় যে কালোনয়না কিষাণী মেয়ে, সেই মেয়ের ভিতর একই সঙ্গে রয়েছে শ্রাবণের ঢল এবং অগ্নিকণা। এই মেয়ের ভিতর এসে দাঁড়ায় মিথসদৃশ সুজাতা, এই মেয়ের ভিতর এসে দাঁড়ায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত মাতৃসত্তা। বুকভর্তি সাঁওতালদের মাদলের সুর নিয়ে এবং চোখভর্তি চন্দনরাঙানো লালচেলির মাতৃরূপ নিয়ে তিনি তাঁর প্রাণবৃক্ষে ঈশ্বরকে গ্রহণ ক'রে বলেন :

'....বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো ?'

(বন্ধুরা বিদ্রূপ করে)

এই চিন্তাসূত্র থেকে অলোকরঞ্জনের কবিতায় দুটি ব্যাপার দ্রুত ঘটে গেল। প্রথমত : সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে গ্রহণ। দ্বিতীয়ত : গোটা পৃথিবীর নাগরিক হয়ে

থাকবার প্রবল বিশ্বাসভূমি। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', ১৯৬৮ সালে 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ', ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'রক্তাক্ত ঝরোখা', ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'ছৌ কাবুকির মুখোশ'—ইত্যাদি কাব্যপর্যায়ে মানুষ এবং ঈশ্বরের একাকারসত্তায় ব্যক্তিকে দেখলেন, মানবাত্মার পর্যায়ভেদ লক্ষ্য করলেন এবং শেষপর্যন্ত ঘাতক হয়ে ওঠা মানুষের মধ্যে শিল্পসম্মত মানুষের বুকের পালক খুঁজতে একান্ত স্বীকারোক্তি দিলেন :

১. '....তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান
আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী
আমি তাঁর কাছে সঁপেছি মনপ্রাণ,
কেননা শহরে পাঠভেদ বড়ো বেশি।'

(যে রাখাল দূরদেশী : নিষিদ্ধ কোজাগরী)

২. '....রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে-থাকার এই বাসাটাও
মন্দ না তাই
সিজিলমিছিল চলন্তি বাড়ির নকশা আঁকছি
আমরা সবাই।'

(ধরুনা : ছৌ কাবুকির মুখোশ)

লক্ষণীয়, 'তবে শোনো' শব্দবন্ধ। ঠিক এরকম সম্বোধনেই জীবনানন্দ একদা বাঙালি পাঠকদের শুনিয়েছিলেন আত্মঘাতী এক মানুষের কথা ; অলোকরঞ্জন যেন বা সেই সম্বোধনকেই অন্য পথে মোড় ফেরালেন, সম্বোধনকে চালিত করলেন মৃত্যুবিরুদ্ধ সম্প্রসারণে। অশ্বত্থ গাছের কাছে দড়ি হাতে থেমে গিয়েছিল একটি মানুষ। অলোকরঞ্জন সেই থেমে-যাওয়া মানুষটিকে ফিরিয়ে এনে তাকে ছড়িয়ে দিলেন আবহমানের ভুবনে। তাঁর কবিতার মানুষটি হয়ে উঠলো—'যে-রাখাল দূরদেশী', তারই অভিন্ন সত্তা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির 'চলন্তি বাড়ি' শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাখালসত্তাকে দূরদেশী করে তুলবার ভ্রাম্যমাণতা। মনে রাখা আবশ্যক, এই রাখালসত্তার সঙ্গে যৌবনবাউলসত্তার কোনো আভ্যন্তরীণ ফারাক নেই। ভ্রাম্যমাণের বিস্ময়ে কোনো স্থির একজায়গায় দাঁড়ানো বাড়ি-ঘর নেই, থাকতে পারে না। তার জন্য চলন্ত বাড়ি। 'চলন্ত' বলেই এই বাড়ির মধ্যে সবাই এসে বসতে পারে, মিলেমিশে থাকতে পারে, এমনকি এই চলন্ত বাড়ির মধ্যেই পাওয়া যাবে জীবনমুকুটের বিচিত্র মোটিফ, যার মধ্যে সংমিশ্রিত আদিমতা ও

আধুনিকতা। এই 'চলন্ত বাড়ি'-র মধ্যেই একদা আদিম মানুষেরা চকমকি ঠুকে আগুনের স্রষ্টা হয়েছিল। আবার এই 'চলন্ত বাড়ি'র মধ্যেই আধুনিক মানুষেরা জড়ো করেছে ট্রামের টিকিট, বান্টিদের হাতে গুঁজে দিয়ে অজিত নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে। একটু খুঁটিয়ে এই 'চলন্ত বাড়ি'-কে দেখলে বোঝা যায় এ-হলো সেই মহাবিশ্ব, যার ভিতর রয়েছে :

'....সকলের অন্যতা অচ্ছিন্নপ্রবাহ এক জীবনচ্ছায়ে।'

এই হলো মানবের মূল পটভূমি, যেখানে আসা-যাওয়ার ক্রমিক তত্ত্বাবধানে একজন কবি জন্ম নেন, মরেন, আবার জন্ম নেন শুধু মহাবিশ্বমাতার চড়ানো রান্না চেটেপুটে খাবেন বলে। মা, মহাবিশ্বমা যখন (দ্রষ্টব্য—ফ্রেস্কো : ছোঁ কাবুকির মুখোশ) বঁটির ওপর বসেন, নারকোল কোড়ান, তখন তো একই সঙ্গে আমরা দেখি মৃত্যুবাহিত বঁটির হিংস্রতাকে বশ মানিয়ে মা মৃত্যুর নারকোল কোড়াতে কোড়াতে আসলে জীবনকেই সুস্বাদু নারকোলফলের রসে আবিষ্কার করছেন। এই দৃশ্য অলোকরঞ্জন ছোটো কবিতার মিত পরিসরে এমনভাবে সেঁটে দিয়েছেন যে গভীর অভিনিবেশ ছাড়া লক্ষ্যই হয় না। আর আলিঙ্গনের মহোৎসবে ছড়াতে ছড়াতে অলোকরঞ্জন এভাবেই পৌঁছে যান চৌকাঠ পেরিয়ে, মা থেকে জল-ভূমণ্ডল-আত্মায় ; গন্ধরাজ থেকে মেঘের দুয়ার খুলতে। এই যাত্রাপথেই তিনি টুক্ করে খুলে দেন মানুষের ভিতরকার পুংপ্রদর্শনীকে। আর তখনি মানব-অন্তরস্থিত ছাউনি থেকে বেজে ওঠে বোল—'দাঁপির্ দাং দাঁপির্ দাং দাঁপির্ দাঁপির্ দাং।' আমরা এই পর্যন্ত পর্যন্ত বলবো, তাঁর কবিতা, 'প্রসন্নতার বোধি-বিন্দু।' যদি আমরা তাঁর প্রথম কাব্যপদসঞ্চারকে এইভাবে বিন্যস্ত করি, যার দ্বারা কবিতার সেন্ট্রাল থিম-কে আয়ত্তসম্ভব :

প্রসন্নতা=নিসর্গের সঙ্গে আত্মার মিলনজ্ঞান
|
শিল্প
[নৈকট্য ও সংশয়]—[পরিবেষ্টনীর যন্ত্রণা]
জন্ম=[জীবনের তাগিদ ও আলো অন্ধকারে ছবি ফোটানোর আশ্লেষ অনুভূতি]
মহাবিশ্বমা—মানবজন্মধারা
মৃত্যু=পুনঃপ্রবাহ
রক্তক্ষরণ=দূরদেশী রাখালসত্তা=[মহাবিশ্বের দর্শকসত্তার অংশ]

তাহলে হয়তো, এতোক্ষণের আলোচিত কবিতার একটি নিজস্ব বলয় সচেতন অভিপ্রায়েই প্রত্যক্ষ হবে। কারণ, এরই অন্তর্গত অলোকরঞ্জন।

২

আকাশের রহস্য এবং মর্তবিন্দুর জটিলতা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কবিকে যে ক্ষতবিক্ষত মর্তাসত্তৃষ্ণ হতেই হয়, এমন উচ্চারণ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় অলোকরঞ্জন করেছিলেন। এই টানাপোড়েনের বক্তব্যস্থাপনে যখন অলোকরঞ্জনের বসবাস অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, তখন থেকেই তাঁর কবিতা আমাদের কাছে রক্ত-ক্ষরণের টিলা হয়ে দাঁড়ালো। আর এখান থেকেই আবশ্যক, নতুন অলোকরঞ্জনের আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে কবিতাশিল্পকে দু-ভাগ করে দিয়ে-ছিলেন—বিচিত্রগামী এবং সর্বত্রগামী। কিন্তু এই দুইয়ের অন্তর্থক অ্যাসি-মিলেশানে শিল্পগভীরে যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, ক্রমে অলোকরঞ্জন সেই সম্ভাবনার পথ খুলে দিলেন। স্মরণযোগ্য, ১৯৮৮ সালে 'World Marxist Review' পত্রিকায় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর সাক্ষাৎকার, পাশাপাশি যদি রাখা যায় 'ডানা' পত্রিকায় (মে, ১৯৯১) প্রেরিত অলোকরঞ্জনের চিঠি, তাহলেই বোঝা সম্ভব আত্মলীন হৃদয়ের চন্দ্রকলা কিভাবে অপসৃত হচ্ছে। অলোকরঞ্জনের সেই চিঠি-ই তুলে ধরি ; প্রশ্নবিক্ষত, প্রশ্নদীর্ণ। গালফে ওয়ারের দিকে তাকিয়ে 'যুদ্ধ' নামক শব্দটি তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় 'দুই-সিলেব্লের অশ্লীলতম' শব্দ। লিখলেন :

"....আমরা যারা যুযুধান শক্তিগুলিকে নিরস্ত করতে পারিনি, শিল্পচর্যাকে নিরপেক্ষ অনুশীলনে পরিণত হতে দিয়েছি, তাদের জন্য বরাদ্দ আজ এক অপরিহার্য অপরাধবোধ। আজকের কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ থেকেও বিশ্বনিয়তির পরিমণ্ডলের জন্য যদি কোনো উদ্বৃত্ত উপলব্ধি পোষণ করতে না পারে, তাহলে আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে আমরা কোনোক্রমেই মার্জনা দাবি করতে পারব না।"

বিম্বা

"....আপাতত গালফের যুদ্ধকালে ও পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যারা কবিতা নামক মহাবিশ্বের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেই এই মরজীবন কাটিয়ে দিতে চাই, তাদের ভূমিকা নিয়েই স্বগত-যৌথ জল্পনা আমার। কোথাও কি কবিতার মহাবিশ্ব আজকের ইহজগৎটিকে

স্পর্শ করেও নিজের কাছে সৎ হয়ে আছে ? কবিতা নামক মহাবিশ্ব যদি মানুষের বোবা পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে বসে, তাহলেই কি সে তার জাত খোয়াবে ? কবিতায় সমসময়ের ঘটনা-স্পন্দ বেজে উঠলেই কি সে তার অভিধা থেকে বিচ্যুত হবে ?"

এসব শুধুমাত্র বিশ্ববীক্ষণের বোধে প্রশ্নধ্বনি নয়। ঘটমানতার মর্মে যে দার্শনিক বেদনা রক্তিমাভা পাচ্ছে, সেই বেদনাপ্রক্রিয়া থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নির্লিপ্ত নিজেকে সরিয়ে আনতে পারেননি বলে 'বলাকা'-র আত্মস্থ বিবেকে সমর্পিত হয়েছিলেন। স্নাত এবং চোখ খোলা একটি মানুষ, তার সাফারিং নয়, টরমেন্ট, কারণ 'সাফারিং' শব্দে সেই রক্তিমাভার ভীষণতা ধরা যায় না, তাই টরমেন্ট, যা অলোকরঞ্জনকে রূপান্তরিত করলো। তিনি সর্বত্র দেখলেন, মানুষ পরিণত 'authoritarian' চরিত্রে, যার অন্তরে-বাহিরে শ্রেণীজাত উদ্বেগ-আশঙ্কা, নিরাপত্তাবোধহীনতা, অবদমিত কামনা-বাসনার দংশন, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ কিম্বা যুদ্ধের নির্লজ্জ প্রস্তুতি ; যা থেকে ক্রমবর্ধমান একধরনের সামাজিক হতাশা। আত্মবলির এ-হেন বিশ্বের কেন্দ্রস্থ তরঙ্গে যুক্ত অলোকরঞ্জন তাই 'ওয়াটার শেড' পর্ব অতিক্রম ক'রে এসে দাঁড়ালেন একটি মহাবিশ্বের সত্যে। তাহলো 'instead of killing and dying in order to produce the being that we are not, we have to live and let live in order to create what we are ;' ফলত অলোকরঞ্জনও উপসন্ধি করলেন 'Hate in the dust' এবং 'Always sees hope on earth', এও কবির সময়-অনুযায়ী দীক্ষামন্ত্র বা জাগরণেরই একফালি চরে এসে দাঁড়ানো, তা নয়তো ভাঙনের মাঝখানে শিল্পেরও মৃত্যু অনিবার্য। এই রূপান্তরিত অলোকরঞ্জনের কাছে কবির দায়বদ্ধতা 'to warm men and to inspire them to struggle along the road which leads to greater happiness ;' কিন্তু যেহেতু অলোকরঞ্জনের মন ও মানসিক স্তরান্তরে বিরাজমান প্রসন্ন ভাষার দীপ্তি, সেই হেতু তাঁর পক্ষে কণ্ঠস্বরকে খুব একটা উচ্চগ্রামে তুলে প্রত্যক্ষতার আক্রমণে শিল্পপ্রসন্নতাকে ব্যাহত করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পবিবেক থেকে নির্গত ফল্গুও যে অনেকসময় মারাত্মক মেজাজী হয়ে উঠে হৃদিপদ্মের ঝুঁটি টান মারে, তাও দেখা গেল তাঁর নিহিত ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিতার অসামান্য নম্রতায়। ধ্বনিনয় রোমকূপ থেকে উঠে এলো সেই স্ফুরণ, যাকে আমরা কেউ কেউ বাজারী ভাষায় বলে উঠতে পারি—উত্তরণের উজ্জ্বলতা। কিন্তু

'উত্তরণ' নামক কূটস্থানে বাঁধতে গেলেই অবিচার করা হবে কবির প্রতি, কবিতার প্রতিও। 'কবিতীর্থ' পত্রিকার ১৪০০ সাল পূর্তি সংখ্যায় রূপান্তরিত অলোকরঞ্জন আত্মপ্রকাশ করেছেন 'আগামী শতকের কবিতা ভাবনা' শীর্ষক রচনায়। এই রচনাটিতে ফুল-লতা-পাতা-বেষ্টিত বাংলা কবিতার প্রতি বিরক্তি এবং মানুষের মুখ উৎকীর্ণ হয় এমন কবিতার প্রতি আসক্তি প্রকাশে যে অকুণ্ঠিত অলোকরঞ্জন দেখা দেন, সেই দ্বিতীয় ভুবনের তিনি লিখে ফেলতে পারেন 'মরমী করাত' (১৯৯০), 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' (১৯৯১) এবং 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ' (১৯৯৩)। 'মরমী করাত' এবং 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' এই কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের উৎসর্গপৃষ্ঠা একটি বৃহৎ অর্থে উদ্ভাসিত, যা অলোকরঞ্জনের নব্য চলমানতার বিশেষ মুদ্রা ধারণ করে আছে। 'মরমী করাত' উৎসর্গ করা হয়েছে বিনয় ও বিদ্রোহের প্রতীক অরুণ মিত্র-কে এবং 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' উৎসর্গ পৃষ্ঠায় মিলিত হয়েছে সমাজ-কাঠামোর ভিন্ন বর্ণের মানুষেরা, অপরিচিত সেইসব নাম, যাদের একত্রে গেঁথে সমাজ-সম্প্রীতির গভীর স্বাদে আপ্লুত হলেন তিনি। উৎসর্গ-পৃষ্ঠার এই তিন-জনের উপাধির ভিন্নতা এবং সমাজ প্রথার হাস্যকর নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো এর দ্বারা। তিনটি নাম যথাক্রমে ললিত মণ্ডল, গোলাম আবু জাকারিয়া এবং সুজিত চৌধুরী। শ্রবণরত পাথরের ভূমিকায় 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থে অলোকরঞ্জন আবির্ভূত হয়েছেন। 'শ্রবণরত পাথর' এই বাক্যমালার তীব্র ব্যঞ্জনায় পাষাণসদৃশ অহল্যার রূপকাভাও যেন প্রতিভাত হলো। অভিশাপে পাষাণে পরিণত হয়ে-ছিলেন অহল্যা। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই পাষাণপ্রতিমার কাছেই জীবনধর্মী নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, জীববাত্রী জননীর দুঃখশোক আনন্দবেদনার সঙ্গে অহল্যা নিজের সত্তাকে কেমনভাবে মিশিয়ে সুপ্ত হয়ে আছে, সে-কাহিনী। প্রাণ থেকে অ-প্রাণের গভীরে প্রবেশের ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথ আসলে বুঝতে চেয়েছিলেন, অহল্যা, যে-নাকি পাষাণ, সে কেমনভাবে জীবতরঙ্গের দোলায় নিজেকে মেলে ধরছে। কিন্তু অলোকরঞ্জন 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থে নিজের সত্তাকেই অ-প্রাণলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে লিখলেন—'আসলে আমি শ্রবণরত পাথর আজ এই নিখিলে' (আজ, এই নিখিলে)। যেহেতু 'শ্রবণরত', তাই অ-প্রাণ পাথরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। শ্রবণরত পাথরভূমিকায় এসে অলোক-রঞ্জন কি দেখলেন আজকের এই নিখিলে ? মূল্যবোধের দারুণ অন্ধকার দেখতে দেখতেই কি তিনি পাথর হয়ে গিয়েছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর 'মরমী করাত' ও 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' কাব্যদ্বয়ের বিভিন্ন স্তরীভূত কবিতায় বিন্যস্ত। 'মরমী

করাত' কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি, শ্রবণরত পাথর অলোকরঞ্জন ক্রমে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন একটি নির্বিশেষ কিশোর-চরিত্রে। এই কিশোরের মধ্যে দিয়েই তৈরি হচ্ছে সৃষ্টিময় চঞ্চলতা ও স্বপ্নসম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট 'রক্তকরবী' নাট্যপ্রতীকে আমরা কিশোরকে পেয়েছিলাম এবং যন্ত্ররাজার নিষ্পেষণে তার মৃত্যুও দেখেছিলাম। অলোকরঞ্জন-সৃষ্ট কিশোর মৃত্যুর বিরুদ্ধে তৈরি করছে 'কম্পোজিশন।' উদাহরণ দেওয়া যাক :

প্রথম কিশোর ।। তাহলে এটা তো মানতেই হবে
তিতুমীর ছিল ভিতরে-ভিতরে
শিল্পী, যে গড়ে, যে শুধুই গড়ে,
শিল্পী যখন নামে বিপ্লবে
নিজেকে সে ভাঙে, অন্যকে গড়ে।

দ্বিতীয় কিশোর ।। জাতক বুদ্ধের মতো এখনো অনেক তিতুমীর
জন্ম নেবে, এবং তাদের
ভুল আর বাসনার উত্তরাধিকার
চরিতার্থ করে শেষে একদিন সর্বাঙ্গীণ মুক্তির
সময়
মানুষকে মনোনীত করে নেবে, আগে দেবে
স্বাধীনতা, শেষে
মুক্তি যা পেরিয়ে যাবে দেশ আর কালের বলয়
এখন সেদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যাওয়া,
এখন সেদিকে শুধু লক্ষ্য রেখে কিছু পরাজয়
তীক্ষ্ম রক্ষাকবচের মতো বয়ে চলা, রক্তে ভেসে
নিজেকে আরেকটু তৈরি করে নেওয়া।'

'বাঁশের বেল্লাটা চলছে'—এর ৪র্থ অংশের এই কিশোরসংগ্রামীর শুদ্ধতায় গৃহীত তিতুমীর, যিনি ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের মিথ, সেই যোদ্ধার গভীর-স্তর থেকেই কথা বলছে কিশোর-চরিত্র। 'মরমী করাত'-এর 'কম্পোজিশন' কবিতাটি এই চিন্তান্তরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে এই কিশোর-অভ্যন্তরে রয়েছে উড়ন্ত পায়রার ডানা, বনস্পতিময়তা, রোদ্দুরের গর্ভ, সৃষ্টিময় বীজ, উর্বাবিরণ। কারণ :

'...প্রতিটি কিশোরের আছে প্রাক্-ইতিহাস। তারা
কিরীট পরছে কিম্বা বিকীর্ণ হয়েছে
শিশিরে-শিশিরে।'

(কম্পোজিশন : ৯)

আর তাই, চক্রান্তের যাবতীয় লগ্নে দ্রুত জন্মান্তর ঘটে যায় কবিসত্তার। অলোকরঞ্জন আহ্বান করেন সেই চঞ্চলতাকে। বলেন :

'...পড়ে থাক তোর
ট্রাক্টর
নেমে আয় তুই
এখানে

যেখানে অঝোর
বৃষ্টি'

(কম্পোজিশন : ৪)

এই চেতনাসূত্রে পড়া আবশ্যক 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়'-এর নানা কবিতা। যেমন 'বলেছিলাম,' 'আয়ুকর,' 'নিরুত্তর শীতে,' 'বলার কিছু,' 'প্রদর্শনী,' 'নেই ভালো খবর' ইত্যাদি সংহত চিন্তার কবিতা। অমিয় চক্রবর্তী বিমান বা এরোপ্লেন নামক যন্ত্রবাহনটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন উড়ন্ত সত্তার ঊর্ধ্বায়নের প্রতীক হিসেবে। অলোকরঞ্জন 'মরমী করাত'-এ প্রথমে আধুনিক বিশ্বের বিমান-ছিনতাইয়ের অনুষঙ্গ গ্রহণ করলেন এবং তারপর 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' কাব্যগ্রন্থে দেখালেন বিমানের ধ্বংসাত্মক অ-মানবিক ভূমিকা। এইসব বোমারু বিমানগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে জ্যোতির্গ্রহের নন্দনতত্ত্বকে বা বিশ্বসংহতির ব্যাপকতাকে। এই কাব্যগ্রন্থে 'কিশোর'-চরিত্র ফিরে আসেনি, এলো 'দেবশিশু'-র ইঙ্গিতময়তা। বিশ্বআবর্জনার মধ্যে শিল্পশুদ্ধতার দেবশিশুকেই অন্বেষণ করলেন তিনি। তিনি দেখলেন চতুর্দিকে জীবন নামক 'পাণ্ডুর সমারোহ'। দেখলেন আমাদের সকলের 'পরিত্যক্ত আত্মপরিচয়'। লিখলেন :

—'দাঁড়িয়ে থাকব : আমরা গৃহ, যদিও গৃহহারা।'

(চট্টগ্রাম : ৯১)

চকিতে মনে পড়ে যায়, অমিয় চক্রবর্তীর প্রবাদপঙ্‌ক্তি—'আমারও নেই ঘর, আছে ঘরের দিকে যাওয়া,' কিম্বা 'তোমরাও নেই ঘর আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' অলোকরঞ্জন ঐতিহ্যের স্বীকরণে অন্য অর্থে উদ্ভাসিত হলেন। আধুনিক বিশ্বের নব মানুষই যে আজ উদ্বাস্তু, তা ধ্বনিত হলো তাঁর ভাষায়। 'আয়ুকর' (রক্তাক্তিত আয়কর) নামক কবিতাটিই এই কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। টানা গদ্যের প্রবহমানতা বজায় রেখে তিনি লিখলেন :

'....আমরা দুজন মিলে বটের বিক্ষিপ্ত ঝুরিগুলি মানুষের অভিমুখে সঞ্চারিত করে দিই। .....যে সব বটের ঝুরি মগ্নচৈতন্যের শিখা জেবলে আছে মানুষকে স্বযাচিত হয়ে তাদের গরজ বুঝে নিতে হবে। ....মানুষের মাঝখানে এইভাবে ঝুরিগুলি উঠে এলে অনেক আলোকতোয়া নদী বয়ে যাবে। ....যতক্ষণ সেই জ্যোতিগ্রহ সম্পন্ন না হয় থেকে-থেকে তার প্রস্তুতির কাজে যোগ দিতে হবে।'

আবহমানের ভুবনে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদিনের বটগাছের ঝুরিগুলোকে বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইলেন অলোকরঞ্জন। কারণ, তা নয়তো তিনি কিভাবে উচ্চারণ করবেন যে 'যুদ্ধ বলে শব্দটাই নেই।' এভাবেই, জীবন-দর্শনের গাঢ়তা থেকে তিনি 'যুদ্ধপুরাণ' কবিতায় বলেন :

—'তোমাকে উপহার দিলাম দৃপ্ত এক বিশ্বনাগরিকতা....'

তিনি দিলেন। এই বিশ্বনাগরিকতা পাবার পর প্রয়োজন যা, তা হলো শুদ্ধতার অনুশীলন, হৃদয়-শুদ্ধতার।

অলোকসামান্য অলোকরঞ্জন

সুজিত সরকার

ঐ যেরকম বলেছিলেন পটভি সীতারামৈয়া
বয়স যেন মহিষদেহে বৃষ্টিধারা

কে এক অলীক অগস্ত্য সেন বলে গেলেন 'মশায় দাঁড়ান
একটু পরেই ফিরে এসে আপনার এই বস্তিপাড়ায়
প্রাসাদ গড়বো'—আমিও খুব দাঁড়িয়ে আছি

বাতাস বহে পুরবৈয়াঁ

কবিতা পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন, উল্লিখিত লাইনগুলির রচয়িতা কে। প্রত্যেক বড়ো কবিরই নিজস্ব এক কাব্যভাষা থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা 'পঞ্চাশের কবি' নামে পরিচিত, সেই তালিকায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম একেবারে প্রথম দিকেই। সুতরাং, তাঁর যে একটি নিজস্ব কাব্যভাষা থাকবে—তা তেমন কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার এই যে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই অলোকরঞ্জন এই নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অনেক প্রধান কবিরাও করতে পারেননি। কবির নিজস্ব কাব্যভাষাকে অলোকরঞ্জন বলেছেন 'স্বরায়ণ'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল'-এই যে অলোকরঞ্জন তাঁর 'স্বরায়ণ' খুঁজে পেয়েছিলেন, নিম্নলিখিত লাইনগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

আজকে তোমার আজন্ম-বন্দীরা
মুক্তি পাবে, তাদের পথে তীর্থতোরণ খুলে
সূর্য হবে রক্তজবা তোমার সোনার চুলে—

তোমার কান্না আমার হাতে আনন্দমন্দিরা !

অলোকরঞ্জন লক্ষ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের দিকের কবিতায় 'চল্‌তি' শব্দের সঙ্গে 'অত্যন্ত পুরোপল' শব্দকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, অলোকরঞ্জনের কাব্যভাষাও এই দু ধরনের শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে :

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
প্রায় প্রতিদিন লক্ষ করি
রাধিকামোহন মৈত্র
বসে আছেন মোড়ার উপর

তাঁর উপরে সৃজনচৈত্র
ঝরে না আর তিনি এখন
সৃষ্টিবিহীনতার সৃষ্টি
মাঝে-মাঝে গানের উপর

দু'তিনটে প্রবন্ধ লেখেন
তাঁর নিজস্ব সরোদখানা
ছাত্র-তীর্থযাত্রিকদের
বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন
অনন্তমূল প্রজ্ঞানন্দে

উপরোদ্ধৃত কবিতায় 'চলতি' শব্দের সঙ্গে 'সৃজনচৈত্র', 'তীর্থযাত্রিক', 'অনন্তমূল', 'প্রজ্ঞানন্দ' এইসব 'অত্যন্ত পুষ্পেল' শব্দের এক সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অলোকরঞ্জনের ছাত্রজীবনের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে। ওই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় অলোকরঞ্জন বলেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা :

এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে,
সকাল আটটার রৌদ্র তাঁর পায়ে শিক্ষার্থীর মতো।

আরো বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের কথা :

যেতে-যেতে রুগ্ন ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখতে পাই,
বয়সবিবর্ণ তাঁর সেই কান্তি, তবু সেই মুখ
পুরনো বটের সদ্য পাতার মতন ফুটে ওঠে।

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র একটি কবিতার প্রথম দুটি লাইন :

শ্রীনিকেতনের মোড়ায়
প্রেমিকযুগল দুপুর ওড়ায়।

শান্তিনিকেতনে থাকার কারণে বীরভূমের গ্রামগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। দক্ষিণ কলকাতায় থাকার কারণে অর্জন করেছিলেন সুভদ্র নাগরিকতা। আর প্রবল ঈশ্বরচেতনা ও অসাধারণ ছন্দোজ্ঞান তাঁর তো প্রথম থেকেই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'ভগবানের গুপ্তচর / মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর / ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।' বহুদিন হলো অলোকরঞ্জন স্থায়িভাবে জার্মানিতে বসবাস করছেন। এর ফলে প্রতীচ্যের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তিনি। এই সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিপুল অধ্যয়ন, ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে এক অভিজাত কাব্যভাষা :

আঁদ্রে জিদের জর্নালে দ্বিধা ছিল,
সংশয় থেকে সাহস পেলাম আমিও,
বুকে দুরুদুরু মৃদঙ্গ বিদারিল,
তথাপি সামনে এগিয়ে ছুঁলাম নীলাভ উত্তরীয়!

প্রান্তরে ছিল ছড়ানো বহুব্রীহি,
চাষীরা ফিরেছে, বয়ঃসন্ধি ভেঙেছে রাখাল ছেলে,
অবতংসের আলো-আঁধারির কিনারে শব্দ জ্বেলে
তাকে বললাম : 'আমি হতে চাই সচ্ছল সুগৃহী।'

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল'-এ অলোকরঞ্জন বলেছিলেন :

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হ'লে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো ?

উল্লিখিত লাইনগুলি যে কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই কবিতার শেষ স্তবক :

এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দ'লে
চ'লে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর ব'লে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে অলোকরঞ্জনকে বলতে শোনা যায় ঃ

মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন,
মগডালে-বসে-থাকা পাপিয়াকে আর
পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র চব্বিশটি অংশে বিভক্ত দীর্ঘ নাম-কবিতাটির প্রথম অংশ শুরু হয় এইভাবে ঃ

আমার বিষয়বস্তু ঃ 'ঈশ্বর'

এবং শেষ অংশ শুরু হয় এইভাবে ঃ

বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়,
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয় ;

যে প্রবল আস্তিক্য থেকে রচিত হয়েছে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি, পশ্চিমী জীবনধারার সংস্পর্শে আসার কারণে তা পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে অনেকটাই কমে এসেছে—এরকম এক ধারণা পোষণ করেন কেউ কেউ। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। যাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন তাঁরা অলোকরঞ্জনকে বুঝতে পারেননি। 'শতভিষা' পত্রিকায় তাঁর যে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল, সেখানে ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 'আমার আগের কবিতায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের বন্দনা ছিল—আজকে আমার ঈশ্বর আরো আমার কাছে নেমে এসেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কেই আজ আমার বিশ্বাস চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে গেছে।..... ঈশ্বরের কথা....আমি অনেক তির্যকভাবে বলি। ....ঈশ্বরকে আমি প্রতিষ্ঠানের থেকে এনে তাকে আমার গোপনতম প্রেমিকে পরিণত করেছি।'—এই বক্তব্যের সমর্থনে, 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি সম্পূর্ণ কবিতা নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

রেমব্রান্টের ছবির গাঢ় বিষণ্ণ আচ্ছন্ন তাঁর শিখা
দেখেও আমার চোখ ভরেনি, খরগোশদের ঘাসের খিড়কি দিয়ে
সাঁৎরানো-খুনসুটির দৃশ্য দেখেছি ঢের ; দেবশিশুর হাতে

পাখির মতন ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ এসে পড়েছে দেখেও আমার
মন ভরেনি ; দরবেশেরা নেচেছিল নক্ষত্রের নিচে
কল্যাণীর মেলায়, তবু খুঁজেছিলাম সত্তার শাশ্বত
আলম্বন বিভাব, নিছক হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় পার হয়ে ;
এবং সেটাই দেখি হঠাৎ ঃ বেড়ার উপর অর্ধেক ভর ক'রে
দাঁড়িয়ে তুমি নিরপেক্ষ, ব্রহ্ম যেমন একটি অক্ষরে—

আঁকতে গেলে জীবন যাবে, টান লেগেছে দেহের অঞ্জলিরে !

কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, কেন অলোকরঞ্জন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠান থেকে নামিয়ে এনে তিনি তাঁর গোপনতম প্রেমিকে পরিণত করেছেন।

অনেকেই হয়তো জানেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ট কবি অমিয় চক্রবর্তী অলোকরঞ্জনের প্রিয় কবি। এই দুই কবির জীবনের মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিজীবনের সূচনাপর্ব, কবি অলোকরঞ্জনেরও শুরুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায়। অমিয় চক্রবর্তী আধ্যাত্মিক কবি, অলোকরঞ্জনও তা-ই। অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন 'জগৎযাত্রী', অলোকরঞ্জনও 'বাউল থেকে বিশ্বপথিক'। অমিয় চক্রবর্তীর ঈশ্বরচেতনা মানবতাবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। 'মানুষের ঈশ্বর' কবিতায় তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলেন, তাঁর রং মাঝামাঝি, চকচকে চুল, নতুন পোষাক, এবং তাঁকে তিনি থিয়েটারে দেখেন নিগ্রো নাটকে। অলোকরঞ্জনও অমিয় চক্রবর্তীর মতো বলতে পারেন ঃ 'আমি মানুষের প্রতি আস্থা থেকেই আধ্যাত্মিক চিন্তায় পৌঁছেছিলাম। মানুষের চোখেই ঐশিকতাকে দেখেছি।' আর এর অনেক প্রমাণ তো ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়, যেমন 'ট্রামলাইনের রাস্তা সারায় রাঙা লণ্ঠন জেবলে / দুটি ঈশ্বর ছেলে' কিংবা 'ভিখারী, আপেল হাতে, অবিকল ঈশ্বরের মতো।'

অলোকরঞ্জনের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার অভিনিবিষ্ট পাঠক সুভাষ ঘোষালের মন্তব্যটি ('মাটি' পত্রিকায় প্রকাশিত, হেমন্ত-বসন্ত সংকলন, ১৩৯৯) প্রণিধানযোগ্য ঃ 'সাধারণত দেখা যায় বেশীর ভাগ কবি ও শিল্পীরা আস্তিক্যবোধে হাঁটতে গিয়ে প্রভাত ও রাত্রির যে-কোন একটি পথ বেছে নিতে চান। গতানুগতি-

কতার চেহারা বলতে এই বেছে নেবার ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাঠকের। কিন্তু যিনি কোন রকম নির্বাচনে যেতে চান না, বরং কোনরকম বিচারে না গিয়ে নির্বিচারে দেখে নিতে চান দুটি আলাদা পথ শেষে একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে যে তৃতীয় পথের সূত্রপাত করে তার অস্থিরতার সম্ভাবনা কতোটা প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে বোধহয় আমরা বলতে পারি উজানমাঝি। অলোকরঞ্জনের কবিতাগাত্রে ছড়িয়ে আছে সেই উজানমাঝির হাসি ও হাহাকারের আশ্লেষ।'

হিমেনেথ তাঁর কবিতার শরীর থেকে একটি একটি ক'রে সব অলংকার খুলে ফেলেছিলেন। অলোকরঞ্জন মূল্যবান অলংকারে ভরিয়ে তুলতে চান তাঁর কবিতার শরীর। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি দু-ধরনের অলংকার তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন : অনুপ্রাস ও উল্লিখন (allusion)। 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতা থেকে লাইন উদ্ধৃত ক'রে দেখানো যেতে পারে অনুপ্রাস অলংকারের সুন্দর ব্যবহার :

ক) তিসিবনে একা শিশু ভেসে আসে নিশুতি-উদাস

খ) দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই-আসি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশী

গ) একরাশ কহ্লার ঠেলে দুলহন আমার
উঠে এল পালকির ভিতরে।

এমনকি তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নাম থেকেও বোঝা যায় অনুপ্রাস ব্যবহারে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা, যেমন 'যৌবন বাউল', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'গিলোটিনে আলপনা', 'মরমী করাত'।

'স্মৃতির শরীরটিকে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে তোলাই পুরাণের কাজ'—বলেছিলেন অলোকরঞ্জন। তাঁর নিজের কবিতায় প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায় এই পুরাণের ব্যবহার—যেমন, 'যৌবন বাউল'-এর অন্তর্গত বহুপঠিত একটি কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন :

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোরবিভা
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী

বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে!
রাত্রি হ'লো।

আর ১৯৯০-এ প্রকাশিত 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থেও সেই পুরাণের প্রয়োগ :

'আমাকে বয়ে
নিয়ে চলেছে অনন্তমুখী গরুড়ের ডানা, আমার নিচে
বিচ্ছুরিত হচ্ছে রাত্রির ইজ্রায়েল—ব্রিজগৎ থেকে বিতাড়িত
এখানকার ইহুদিদের নিয়ে দুর্গাশঙ্কর একটা বিক্ষুব্ধ ডক্যুমেন্টারি
তুলবে ভেবেছিল।'

অন্ত্যমিলের ব্যবহার অলোকরঞ্জনের কবিতায় বিস্ময়কর। 'এর আগে'র সঙ্গে 'চেরাগে'র কিংবা 'ডমরু'র সঙ্গে 'অমরু'র মিল কেমন স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু বিপুল শব্দভাণ্ডারের মালিক না হ'লে এই মিল ঘটানো প্রায় অসম্ভব। বাংলা কবিতার রাজ্যে অলোকরঞ্জন না এলে আমরা কি কখনো ভাবতে পারতাম 'নম্র কিশোর ভাবো'র সঙ্গে 'সিতকঞ্জনাভ'র মিল সম্ভব হতে পারে?

রহস্যময়তা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কবিতাকে আরো বেশি সুন্দর ও রহস্যময় করে তোলার জন্য কবিরা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কবিতা থেকে কোনো শব্দ বা লাইন কিংবা কোনো ঘটনার বিবরণ বাদ দিয়ে দেন। পাঠকরা নিজেদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই শূন্যস্থান পূরণ করে নিন—এরকমই এক ইচ্ছে জেগে ওঠে কবিদের মনে। কবিদের ব্যবহৃত এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'এলিমিনেশন্'। অলোকরঞ্জন এই 'এলিমিনেশন্' পদ্ধতিকে কেমন চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিচের কবিতাটি :

ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দু-জন,
ধানখেতে শিশু রেখে পালাচ্ছে দু-জন ;

'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন ;
'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন।

'সাঁকো বেয়ে নিচে এস' এ ওকে বলল,
'সাঁকো বেয়ে নিচে এস' এ ওকে বলল।

আর নেমে এসে দ্যাখে সুন্দর কাঁথায়
রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকো যায়।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে একটি গল্প লুকিয়ে রয়েছে। কবি সেটি ইচ্ছে করেই আমাদের বলেননি। এর ফলে কবিতাটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একধরনের রহস্যময়তা, কবিতাটি অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র একটি শব্দের বদল ঘটিয়ে নিছক একটি বিবৃতিকে অসাধারণ একটি কবিতায় উত্তীর্ণ করে দেবার মতো আশ্চর্য কবিত্বশক্তির অধিকারী অলোকরঞ্জন। যেমন 'জবাবদিহির টিলা'র অন্তর্গত 'শুধু, তবু' কবিতাটি :

করাতের গায়ে শুধু লেগে থাকে কাঠের গুঁড়ো।

অবিবেকী কবি মজলিশে গিয়ে গোষ্ঠী গড়ে,
কাপুরুষ দেখে সংগ্রামীরাও লুকিয়ে পড়ে
একটি শিশুর ছায়ার আড়ালে, ভিটেবাড়িতে
বাস্তুসাপের আশ্রয়ে একা আঁকড়ে ভিটে
জরতীপিসিমা, টিনের চালাও উড়েছে ঝড়ে

করাতের গায়ে তবু লেগে থাকে কাঠের গুঁড়ো।

ছন্দ, অনুপ্রাস ও অন্ত্যমিলের কারণে অলোকরঞ্জনের কবিতা পড়তে সকলেরই ভালো লাগে। কিন্তু পড়তে পড়তে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনেক অজানা বাংলা শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, যেমন 'কাঁতির কিঞ্জল', 'বধূর কূর্পাসক' ইত্যাদি। তাঁর কবিতার পাঠক হিসেবে এই এক লাভ হয় আমাদের সকলের। এর থেকেও বড়ো লাভ অবশ্যই এই যে তাঁর কবিতা পড়ে পরিশুদ্ধ হয় আবেগ, শিক্ষিত হয় ভাষা, সমৃদ্ধ হয় মন। 'কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশ্যাসিত অসুস্থ পাগলামি'—প্রথম কাব্যগ্রন্থেই একথা বলেছিলেন যিনি, সেই শ্রদ্ধেয় কবিকে একজন সামান্য কবিতা পাঠক হিসেবে দূরে থেকে প্রণাম জানাই।

ভাবুকের গদ্যচিন্তা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের গদ্য আদর্শ

নিখিলেশ গুহ

এক দশকের অল্প কিছু বেশি আগে আধুনিক বাংলা গদ্যের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভঙ্গি বিশ্লেষণেই আলোচনাটি নিবেদিত। নদী-স্রোতের সঙ্গে ভাষাপ্রবাহের তুলনা এই প্রসঙ্গে এসেছিল তাঁর মনে :

"তাঁর (বুদ্ধদেব বসুর) গদ্যে ছায়াচ্ছন্ন শৈবালরাশির মতো উঠে আসে যুক্তিধর্মী উপমা এবং অব্যর্থ বিশেষণ। এদের তলে তলে অবশ্যই থেকে যায় বাস্তব পাষাণখণ্ড, নিঃশব্দ কৌতুকে ধারণ করে রাখে উপরিতলের বাঙ্ময় তানবিস্তার। কবিরা তাঁদের ডানা দিয়ে পৃথিবীর মাটিতে তেমন ভালো করে হাঁটতে পারেন না, এই মর্মে ব্যক্ত সংকীর্ণ হ্যাজলিটের অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে আলংকারিকের 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি' বচনটির প্রাসঙ্গিকতা এখানে নির্ভুলভাবে মানিয়ে যায়।"

বঙ্কিম এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অতীতে বাংলা গদ্যের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, বর্তমানে সেভাবে গদ্যশৈলীর নতুন এক দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব রেখে গেছেন বলেই অলোকরঞ্জনের বিশ্বাস। প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়েও রচনার প্রসাদগুণ এবং কল্পনাশক্তির সাহায্যে কিভাবে পাঠকমন জয় করা যেতে পারে—বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশৈলী তার উদাহরণ—অলোকরঞ্জন এই কথাই সবিশদ করতে চেয়েছেন। সুধী পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে ঐ একই গুণে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভূষিত দেখেছিলেন বুদ্ধদেব। বস্তুত অলোকরঞ্জনের ঐ প্রবন্ধ, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা', পড়তে পড়তে 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' নামে বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ নিবন্ধটি মনে পড়াই স্বাভাবিক, যার শুরুর বাক্যটি হ'লো :

'রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো ; তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন।'

উপপাদ্য সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বুদ্ধদেব আরো বলেন :

'যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প ; যেখানে পাঠককে

স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায়, সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ করে তোলেন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে, সেখানে তিনি বেআইনি-ভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন।'

'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' প্রবন্ধের লেখকের দৃষ্টি অবশ্য বুদ্ধদেব, একান্তভাবেই বুদ্ধদেবের ওপর নিবদ্ধ। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ সেখানে স্থান পায় না। একেবারে বাদও পড়ে না যদিও যেহেতু তরুণ বুদ্ধদেবের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উল্লেখ না করে উপায় নেই—সে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের নিজের-ই স্বীকারোক্তি এত স্পষ্ট ও অজস্র। (অলোকরঞ্জন স্মরণ করেছেন 'অ্যান্ এক্র অফ্ গ্রীন্ গ্রাস্' থেকে প্রাসঙ্গিক একটি পঙ্‌ক্তি।) সব মিলিয়ে, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের গুণ ব্যাখ্যানে অলোকরঞ্জন যে কারণে পঞ্চমুখ তা রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার অঙ্গভূষণ বলে বুদ্ধদেব যা বিবেচনা করেন তা থেকে বিশেষ পৃথক নয়। প্রাসঙ্গিক বোধে 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' থেকে নিচের অংশটি উদ্ধৃত হল :

'তাঁর (বুদ্ধদেবের) প্রিয় গদ্যশিল্পী ওয়াল্টার পেটারের "If style is the man, it is also the age" নিরুক্তিটির নিকষে বুঝে নেওয়া যায় বুদ্ধদেবের রচনায় ব্যবহৃত বাগ্‌বন্ধে সমসাময়িকালের অমোঘ প্রস্বর ; এবং ঐ সমস্ত বুলি বা বচনের আড়ালে যে অমর্ত্য মাধ্যাকর্ষণগুণ অনুধাবন করা যায় সেটি প্রমাণ করে, তিনি ধ্বনি ও অর্থের পারস্পর গ্রন্থনার সাহায্যে এমন একটি ব্যক্তিবিশ্ব (multiverse) তৈরি করে নিতে চান, যার সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের বস্তুবিশ্বের (universe) সম্বন্ধ রয়েছে। এই আত্মীয়তা সত্ত্বেও তাঁর নির্মিত ভাষার জগতে তিনিই নির্মাতা, এবং সেই জগৎটি হৃদয়ের সুষম আধিপত্যে স্বয়ম্পূর্ণ।'

গদ্যের যে প্রসাদগুণের কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব এবং বুদ্ধদেবের প্রতি অলোকরঞ্জন আকর্ষণ বোধ করেন তা যে নির্দিষ্ট কোনো শিল্প প্রতিমান আশ্রয় করে নেই, সচেতন পাঠক আশা করি স্বতই উপলব্ধি করবেন। বস্তুত উত্তরাধিকার, তা সে বিষয়সম্পত্তি বা চিন্তাক্ষেত্র যে স্তরেই হোক, বাস্তবে কাজে না লাগিয়ে কখনোই রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাংলা গদ্যের যে অভিনব শিল্পবিন্যাস পরিকল্পনা করছিলেন বুদ্ধদেব পঞ্চাশ দশকের শেষ এবং ষাট দশকের শুরুতে, তা এমন এক সময়ে ক্রমশ আকার নিতে থাকে যখন বাংলা কবিতা তরুণতর এক প্রজন্মের (অলোকরঞ্জন এবং তাঁর সমসাময়িকরা যার অন্তর্ভুক্ত) নেতৃত্বে নতুন পথের

সন্ধানী। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার আদর্শ ছিল এই পালাবদলের রচয়িতাদের সামনে। তাঁর গদ্য উন্মুক্ত করছিল অনাস্বাদিত এক বিশাল প্রান্তরের শস্যসম্ভার, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বোদলেয়ার প্রমুখের শিল্প পরীক্ষার ফলে যা ইউরোপের মানসলোকে ক্রমশ বিস্তার পায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রথম নেতৃত্বদানের প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধদেব এই নান্দনিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটান। ধ্রুপদী ও আধুনিক রুচির মধ্যে কোথায় কখন কিভাবে সমন্বয় সাধন হয়েছে, বস্তুত ঐরূপ সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ শিল্পবিকাশের রূপ—রস-সাহিত্যের বিভিন্ন সমালোচনার মাধ্যমে সে বিষয়ে পাঠককে বুদ্ধদেব সবিশেষ অবহিত করার চেষ্টা করেন ; উদাহরণত, 'বোদলেয়ার—তাঁর কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে নিচের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে :

'ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়।'

এই প্রত্যয় অবলম্বন করে উত্তরকালে কেবল বুদ্ধদেবের কবিতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়নি, তাঁর গদ্যভঙ্গিও আমূল রূপান্তরিত হয়েছিল। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনাকালে তাঁর অনুজ সহকর্মীরূপে অলোক-রঞ্জনের চোখে তা ধরা পড়েছিল। 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' নামে উপরোক্ত আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তুলনামূলক সাহিত্যের আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বুদ্ধদেব এবং সুধীন্দ্রনাথ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এমন এক ভাষার যা পাঠকমনে স্বরক্ষেপের স্পষ্ট আবেদনে অভিষিক্ত হবে। এরকম সিদ্ধান্তের মর্মবাহী হওয়া ছাড়াও 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা'য় অলোকরঞ্জন আমাদের সনাক্ত করতে সাহায্য করেন বুদ্ধদেবের গদ্যের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন আলংকারিকদের উদ্ধার করে, যাকে তিনি বলেন 'সুহৃদ-সম্মিত / কান্তাসম্মিত' গদ্যের 'প্রপঞ্চনিপুণ আয়োজন।' এইসব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের গদ্যে আবিষ্কার করে পুলকিত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব—অলোকরঞ্জন না বললেও সে-সত্য আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বর্তমান প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই আমি এরকম নির্দেশ দিয়েছি। আরো কিছু সাদৃশ্যের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, যতিচিহ্ন ব্যবহার—বাক্যের গঠন এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ যার দ্বারা নিরূপিত হয়। এর নিপুণ প্রয়োগের ফলে বুদ্ধদেবের পক্ষে গদ্যে সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে বলে অলোকরঞ্জন যখন মন্তব্য করেন, কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠকের স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয় নাকি 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' নামক যে-আলোচনাটির উল্লেখ ইতিমধ্যেই আমাকে করতে হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি!

'কমা-সেমিকোলোনাদি বিরতিচিহ্ন বাংলা গদ্য যেদিন স্বীকার ক'রে নিলে, সেদিনই ব'লে দেয়া যেতো যে, আপন প্রতিভার নির্বন্ধেই, সে বহুলাঙ্গ উপকরণে অন্যান্য আধুনিক ভাষার প্রতিযোগী হয়ে উঠবে।'

ওপরের মন্তব্যটি যদিও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা এবং তাঁর নিজের রচনায় ইংরিজি অন্বয়ের প্রভাব সম্পর্কে সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডাতে যদিও বুদ্ধদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বুদ্ধদেবের গদ্যে বাক্য যেরকম ক্রমশ বিসর্পিল হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তার সামান্য আভাস নেই। বাক্‌স্পন্দের প্রতি আনুগত্য উভয়ের রচনাকেই গতিময়, গীতিময় করেছে; কিন্তু কত ভিন্নভাবে! প্রাঞ্জলতার দাবিকে সামান্য আহত না করে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে মনোযোগী হয়েও বুদ্ধদেব যে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রকাশে চেষ্টাশীল হয়েছিলেন তার কারণ হতে পারে চোখের সামনে তিনি দেখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পরিণাম, বুঝেছিলেন কবিতার মতো গদ্যেও রবীন্দ্রনাথের আপাতসারল্য কতখানি অন্তর্গূঢ় অভিনিবেশের ফল—কতখানি শিক্ষাপ্রদ, যদি শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে আমরা তাঁর দ্বারে উপস্থিত হই। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার মূল্য এই যে, প্রথমত, সে-শিক্ষার চাবিকাঠি তিনি আমাদের হাতে তুলে দেন এবং, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা সে-শিক্ষা কত বিচিত্র ফলপ্রসূ হতে পারে তার উদাহরণ স্থাপন করেন। বুদ্ধদেবের গদ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণে অলোকরঞ্জনের প্রযত্নের পশ্চাৎপটেও তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের নিজের উক্তি উদ্ধার প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে:

'যে-সুরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘ'টে থাকে—আমাদের আবেগ ও নৈরাশ্য, সংশয়, উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস,

এই সবকিছুর এক আদর্শ ধ্বনিরূপের নামান্তর হ'লো রবীন্দ্রনাথের গদ্য।'

('রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প', বুদ্ধদেব বসু)

'এ সংহতি সেখানেই সবচেয়ে সার্থক যেখানে তিনি (বুদ্ধদেব বসু) উপশিরা গ্রন্থিল সত্তার নিগূঢ় ঝুরি বিষয়ের চারপাশে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। গদ্যের বহিরঙ্গে উপবাক্য / বাক্যের ভিতরে অনুস্যূত বিবিক্ত প্রত্যংশের প্রবলতা ও প্রাচুর্যে এর যথার্থ স্ফূর্তি। যৌগিক গদ্যের প্রারম্ভিক ও সমাপ্য অংশগুলির (Protasis / Apodosis) অন্যান্য অন্তর্বয়ন ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠেছে এবং ঐ রহস্যময়তা বিশদীকরণের চাহিদা থেকেই নির্গত।'

('ভাবুকের গদ্যচিন্তা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

উদ্ধৃত অংশ দুটি কেবল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্য প্রয়োগে সবচেয়ে সার্থক দুই শিল্পীর রচনা-কৌশলের অন্তঃপুরে আমাদের নিয়ে যায় না, সমালোচক হিসেবে অলোকরঞ্জনের বৈশিষ্ট্যও উদ্ভাসিত করে—বৈশিষ্ট্য কেবল বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, নিজস্ব ভাষা নির্মিতিতেও। বাংলা গদ্য সাহিত্যে বুদ্ধদেব যে নতুন মান সংযোজন করেছেন, অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই পাঠকসমাজ সে সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হলেও কি করে এই নতুন মান সৃষ্টি হ'লো তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো। 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' রচনা প্রকাশের পূর্ববর্তী বা নিকটবর্তী কিছু আলোচনার কথা স্মরণ করলে অলোকরঞ্জনের সাহিত্যভাষা প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য আরো কিছু স্পষ্ট হবে আশা করি। প্রাসঙ্গিকবোধে উল্লিখিত হতে পারে অরুণকুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে বামপন্থী তার্কিক-ভাবুক অশোক মিত্রর শ্রদ্ধা নিবেদন, 'কবিকাহিনী'। রচনা দুটির মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় এক দশকের।

অরুণকুমার লিখেছিলেন ১৯৬৮ সালে বুদ্ধদেবের অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর একজন হিসেবে। ষাট বছরে তখন প্রবেশ করতে চলেছেন বুদ্ধদেব, কালের গর্ভে তখনো রয়ে গেছে শেষ জীবনে তাঁর গদ্যের আশ্চর্য উজ্জ্বল সব প্রকাশ—'মহাভারতের কথা', যা অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, এবং মনোজ্ঞ কিছু স্মৃতিচিত্র। গুণমুগ্ধ অরুণকুমার অবশ্য তখনই রবীন্দ্রনাথের গদ্য অপেক্ষা তাঁর প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেন অধিক মাত্রায়, নিচের এই মন্তব্যে যেমন—

'রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বুদ্ধদেবের প্রবন্ধও ইঙ্গিতধর্মী, তাঁর রচনাও মূলত কবিতার সম্প্রসারণ, শব্দের সুচারু বয়ন। কিন্তু তুলনায় দ্বিধা না-ক'রেই বলব, বুদ্ধদেবের গদ্য, বিশেষত তাঁর সম্প্রতিকালের গদ্য ঢের বেশি সংযত, ঘনসংবদ্ধ এবং নির্মমভাবেই আত্মসচেতন।' এই ধরনের উক্তিকে ঘিরে স্বভাবতই যে ধরনের বিতর্কের সম্ভাবনা থাকে তা যদি এড়িয়েও যাই, সমসাময়িক পাঠকমনে বুদ্ধদেবের গদ্যের বিপুল আবেদন অনস্বীকার্য। অশোক মিত্রর মতো সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী তত্ত্বজ্ঞ মানুষও তার প্রমাণ দেবেন—

'তত্ত্বগত আলোচনা, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা, যা-ই মনে করুন না কেন, চিন্তার আড়াল কথনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, প্রবন্ধের যুথবদ্ধ সারি অচিরে তাদের পরিচয় বদলে ফেলে, তারাও কবিতা হয়ে যায়।.... ভ্রমণকাহিনী বা 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ? নামে কী এসে যায়, সব, সবই কবিতাতে রূপান্তরিত, ফুলঝুরির মতো কবিতা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, কবিতার ক্লান্তিহীন দিগ্বলয়, আলো, গান, মূর্ছনা, কবিতা আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

('কবিকাহিনী', অশোক মিত্র)

কিন্তু গদ্যের এই আলোকবিচ্ছুরণ কি কেবল আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে? সমালোচকের প্রয়োজন হয় শিল্পকলার রহস্য বিশ্লেষণ করে সৌন্দর্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে। 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা' প্রবন্ধে অলোকরঞ্জন সেই দায়িত্ব পালনেই অগ্রসর হয়েছেন। বিশ্লেষণ ও রসোপভোগের মধ্য দিয়ে কিভাবে তিনি সিদ্ধান্তের দিকে উপনীত হন দ্যাখা যাক। নির্ভুল তিনি বলেন, 'হৃদয়ের যুক্তিই বুদ্ধদেবের গদ্য-ভাষার প্রধান অঙ্গভূষণ "কিন্তু তাঁর প্রথম পর্বের বিষয়ী এখানে 'স্থির বিষয়ের দিকে' ধাবমান, যেখানে বিষয় বলতে সাংসারিক অর্থে নিতান্ত সারবস্তুর ব্যাখ্যাকেই উপজীব্য করে তোলা হচ্ছে না। কথকতার লালিত্য এখানে দার্শনিক পৌরুষেয়তায় আশ্রিত, সংগীতের গতিরূপে ভাস্কর্যের শরীর স্থিতিচ্ছন্দ বা Gestalt আধৃত হতে পেরেছে। এখানেই বুদ্ধদেব পরবর্তী বাংলা গদ্যের নতুন সম্ভাবনাময় গঙ্গোত্রী সন্ধান।"

প্রবন্ধের বাহন হিসেবে উপযোগী ভাষা ছাড়া অলোকরঞ্জন আরো একধরনের গদ্যের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন, তা শিশুদের কল্পনার রাজ্যের, উপেন্দ্রকিশোর এবং অবনীন্দ্রনাথ যার অধীশ্বর। এখানেও গদ্যের অন্তঃস্থ ধ্বনিপ্রবাহ তার আগ্রহের

কারণ হয়। উদাহরণত, উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' রচনায় সংলাপের বিশেষত্ব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

'এই সাঙ্গীতিক সংলাপের নিকটতম তুলনীয় শিল্পরূপ জর্মন Singspiel—যেখানে কমিক অপেরা প্রাত্যহিক কথোপকথনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রুক্ষ লালিত্যের আবেদন আনে।'

চিত্রভাষা এবং ধ্বনিভাষা অবনীন্দ্রনাথের রচনায় প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে, কিম্বা সুকুমার রায় 'হ-য-ব-র-ল' এবং অবনীন্দ্রনাথ 'মারুতির পুঁথি' গ্রন্থে 'চম্পু-রীতিতে সুরেলা বিকারের মধ্য দিয়ে মগ্নচেতনস্রোত বা Stream of Consciousness পদ্ধতির রূপভেদে পৌঁছেছেন'—অলোকরঞ্জনের এইসব সিদ্ধান্ত কবিতার প্রতি তাঁর প্রবণতার পরিচয়ই দেয়। লোকসাহিত্য থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে আনার সময়ে 'গদ্যের তটে যে-ঢেউ লাগে' তার উল্লেখে এই মানসিকতাই কাজ করে। উপেন্দ্রকিশোর কিম্বা অবনীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কিত অলোকরঞ্জনের প্রথম দিককার প্রবন্ধ থেকে সরে এসে 'দ্বিতীয় ভুবন', তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ, যদি পাঠ করা যায় তবে দেখবো, সংগীতের প্রতি সেই একই আত্যন্তিক আগ্রহ :

'রবীন্দ্রনাথ আসলে গদ্য ও কবিতার অন্তঃস্থ বিভাজনরেখাটি আপেক্ষিকতায় দুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রক্রিয়াটি বোধহয় এরকমই ঠেকে থাকবে; গদ্য থেকে কবিতার জগৎটি ছেঁকে নিয়ে পরিশেষে গানের ভিতরে তাকে এমনভাবে পরিশীলিত করে তোলা যেন জীবন তথা প্রাণের স্পন্দন তার ভিতর থেকে বাদ না যায়।'

(শব্দের মুক্তি, কবিতার উত্তরাধিকার ও রবীন্দ্রসংগীত)

কিংবা

'এই গীতিকবিতার (পথের ধারে) ফ্রেমে এক সুরশিল্পীকে ধরতে পারার আনন্দ আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল। এমন-কি তার ভিতরে আমার কবিতার সাজসরঞ্জাম অকাতরে ব্যবহার করবার অপরিহার্য প্রলোভনও।'

(অনুষঙ্গ : 'পথের ধারে')

অলোকরঞ্জনের কবিতায় যে একটি মরমী মনোভাব সর্বদাই প্রচ্ছন্ন আছে,

তাঁর গদ্য সম্পর্কিত কোনো রচনায় তার উল্লেখ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিশেষত যখন আমাদের বক্তব্য, তাঁর কবিস্বভাবই তাঁর গদ্যকে শাসন করছে। পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রশ্নও সেই সঙ্গে এসে পড়ে, যেহেতু প্রাবন্ধিকের লক্ষ্যই হলো তাঁর নিজস্ব বোধ, উপলব্ধি বা অনুভব পাঠকের হৃদয়-মনে সঞ্চারিত করা। অবনীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য যেভাবে কল্পনায় অন্য ভুবন রচনা করে, কোনো প্রাবন্ধিকের পক্ষে সেরকম আত্মগত জগতে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব হয় না। বরং আত্মস্থ একটি বিন্দুতে তিনি পাঠকের প্রতি আন্তরিক ভাববিনিময়ের আহ্বান জানান। অলোকরঞ্জনের একটি প্রবন্ধে সে আমন্ত্রণের ভাষা :

"সত্যকাম লেখকের সতর্কতা। তিনি ক্রমেই সচেতন হতে থাকেন, তাঁর খসড়া যেন অত্যুৎসাহের ঔদ্ধত্যে ক্ষয়ে না যায়, যেন আত্মক্ষালনের মধ্য দিয়ে রচিত হয়ে ওঠে তাঁর অর্ঘ্য নব্য চিরন্তনী মহাকালের সমীপে। যে অবিশ্রান্ত মন্থন গ্রন্থনার মধ্য থেকে নির্লোভ সৌজন্যে তিনি তুলে আনেন একটি পবিত্র পৃষ্ঠা, পাঠকের প্রতি তার চেয়ে বড়ো নৈবেদ্য কি আর কিছু আছে? ক্ষণখ্যাতির উৎকোচ নয়, সংস্কারসুলভ উপহার প্রবৃত্তি নয়, শুধু একটি অমূল্য নিমগ্নতা—এই কি মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সুভদ্র উপহার নয়? এ যেন নিজের কাছেই নিজেকে ফিরিয়ে দেওয়া, এই বোধটুকু সম্বল করে সাম্প্রতিক লেখক তাঁর পাঠককে বলতে পারেন : 'আমিই তো আপনি'।"

('সাম্প্রতিকতা, পাঠক', 'স্থির বিষয়ের দিকে')

পাঠকের সঙ্গে অলোকরঞ্জনের ভাব বিনিময়ের পথে—মাঝে মাঝে অভিযোগ উঠেছে—ব্যবধান সৃষ্টি করেছে ভাষা। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য ছিলো তাঁর গদ্যের আদর্শ ব্যাখ্যা। এখন, এই অন্তিম অনুচ্ছেদে, পরিসরের সীমা লঙ্ঘন না করে উপায় নেই উত্থাপিত সমস্যা মোকাবিলা করার। এটুকুই বলা যেতে পারে, পাঠক যদি তাঁর রচনা অধ্যয়নের ক্লেশ স্বীকার করেন তবে একেবারে বঞ্চিত হবেন না। তাঁর গদ্যভূমি উচ্চাবচ কিন্তু সেখানে পাষাণে ফুল ফোটে এবং বাক্‌স্পন্দের লক্ষ্য হয় ঊর্দ্ধমুখী, যেহেতু গদ্যের সমতল ছেড়ে তিনি কবিতায় উত্তীর্ণ হতে চান, তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। 'গদ্যের রান-ওয়ে থেকে কবিতার আকাশযান আচমকা একসময় উড়াল দেয়, এবং সেই সন্ধিক্ষণেই গদ্য ও কবিতার পাঠক চিরকালের জন্য আলাদা হ'য়ে যায়।' জীবনানন্দ প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জনের এই উক্তি

('জীবনানন্দ', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত / প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮০)

গদ্য-পদ্যের মধ্যে যে বিভাজনরেখা মুছে দিতে আধুনিক সাহিত্য অনেক সময় বদ্ধ-পরিকর, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে না হতে পারে। কিন্তু মূলত তিনি যে কবিতায় সমর্পিত, তাতে সন্দেহ থাকে না। যে উন্নত অভিনিবেশ (high seriousness) তাঁর গদ্যের অন্যতম লক্ষণ, পাঠক যদি তার জন্য সর্বদা উপযুক্ত না থাকেন তবে তাঁর কবিতাতেই কবিকে অনুরোধ জানানো সম্ভব—

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধূলি হলো।

(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে)

অলোকরঞ্জনের একগুচ্ছ 'বিভাব' কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তবু খুঁজেছিলাম সত্তার শাশ্বত
আলম্বন বিভাব, নিছক হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় পার হয়ে বিভাব

কোনো পথ-চলতি সংলাপিকার টুকরো, প্রিয় কোনো পুঁথির একটি বর্ণনাংশ, বাক্-ছন্দের ডৌল অথবা স্পন্দমান একটি প্যাটার্নের সন্ধান—এই সমস্তই, এবং এদের সঙ্গে চক্রান্তরত যাপিত জীবনের বিভাব—ঐ পটভূমিকায় অনুস্যূত হতে পারে।

মুহূর্ত এবং পটভূমি / দ্বিতীয় ভুবন

কবি এখানে সমস্ত ব্যাপারটার দর্শক মাত্র, তিনি একটি বিড়ালকে বিভাব করে এই কবিতাটি লিখেছেন।

দ্বিতীয় ভুবন / ঐ

ভাবতে ইচ্ছে করছে আনুষ্ঠানিক কর্মসূত্রে বস্টন-বসতির অবসানে এই কবিতাটির বিভাব সূচিত।

একটি কবিতার জন্ম : ৩ / স্থির বিষয়ের দিকে

গদ্যে এবং কবিতায় অনন্য প্রয়োগে অলোকরঞ্জনের আগে 'বিভাব' শব্দটির এমন বিদগ্ধ ব্যঞ্জনা আমরা আর পেয়েছি কি? অলংকারশাস্ত্রে যে শব্দটি অস্তিত্বহীন ছিল, তা নয়, কিন্তু এর ব্যবহারযোগ্যতা বিষয়ে কেউই তেমন আস্থাশীল হতে পারেননি, পারেননি সাহসে আর সপ্রতিভতায় শব্দটির মধ্যে সেই বাঞ্ছিত আভিজাত্যের সঞ্চার করতে। বিষয়-উদ্দীপনা সম্পর্কিত শব্দটি কবিতার অনুষঙ্গে নিশ্চয়ই অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে, একটি সমগ্র কবিতাগ্রন্থের উদ্ভাসক ভাবনা থেকেও সম্ভাবিত হতে পারে 'বিভাব' কবিতা, কিন্তু গদ্যের শরীরেও যে শব্দটিতে যুক্ত করা যায় অন্যতর মাত্রা, 'দ্বিতীয় ভুবন' এবং 'স্থির বিষয়ের দিকে' তার সাক্ষ্য দেবে। বর্ণহীন ভূমিকার বদলে 'বিভাবসূত্র' লিখতে তিনি স্বস্তিবোধ করেন বেশি। আসলে শব্দটির প্রতি অলোকরঞ্জনের এবধরনের অমোঘ দুর্বলতাও অপ্রকাশ থাকেনি কোথাও। 'বিভাব' নামাঙ্কিত কবিতাও যেমন তাঁকে লিখতে হয়েছে একদিন, 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই কবিতায়; তেমনি

ধারাবাহিক প্রথায় তাঁকে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাগ্রন্থের উদ্বোধনে লিখতে দেখেছি এই 'বিভাব' কবিতাগুচ্ছ। গ্রন্থচরিত্র অর্জিত হয়ে গেছে এই মিতবাক ফসলগুলি থেকে, বিভাব-নিহিত উদ্দীপক ভাবনাই প্রস্তাবিত হয়েছে এক-একটি গ্রন্থের যাবতীয় অবশিষ্ট পাতার ক্রমিক নির্মাণে। অলোকরঞ্জনের এই মৌলিক রেওয়াজই বলতে পারি সংক্রামিত হতে দেখেছি সাম্প্রতিক অনেক কবির অনুচর্যায়।

১৯৫৯-এ তাঁর আত্মপ্রকাশ 'যৌবনবাউল' দিয়ে। সেই সূচনাতেই লগ্ন হয়ে আছে একটি ছন্দোময় বিভাব-কবিতা। আরম্ভিক প্রয়াসপর্বে যেহেতু আঁটসাট ছন্দের প্রাবল্য ছিল, তাই এ কবিতায় প্রথাসিদ্ধ প্যাটার্নই অনুসৃত হয়েছে :

গঙ্গাজলে উঠুক পাপ সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।
ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।

এই ছন্দের গঠনে কোনও পর্যায়ে আর কি তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন? করেছেন হয়ত বা দু-একবারই। কিন্তু পর্বান্তরেও তিনি যে ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর সাম্প্রতিকতম কবিতাকৃতিও। ছন্দের চর্চা করায়ত্ত করেই তিনি শুরু করেছিলেন একদিন, শব্দের অপ্রচল প্রয়োগে সিদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকেই। ১৬ লাইনের কবিতাটিতে 'অপ্রতাপ', 'অপ্রসর', 'মরণমদমাতাল ডোম' শব্দগুলি আমাদের ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়ে প্রথম দৃষ্টি দাবি করেছিল; আমরা আরও সচকিত হয়ে উঠেছিলাম তাঁর সাহসী বাগ্‌বৈভবের এক টুকরো পেয়ে :

মানুষ গেলে নামের খনি, আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা।

সেই শুরু, তারপরে ক্রমিক সম্প্রসারণ। ওই বইতেই ছড়িয়ে ছিল 'অনার্দ্র আর্দ্রতা', 'হিমার্ণব', 'বিভোরবিভা', 'ঘুমনিবিড়', 'অগরুক গন্ধের ঘূর্ণিট', 'অণুমঞ্জরী', 'আনম্র অঙ্কুর'-এর মত সচিত্রসংবেদী শব্দমালা। এদের প্রাচুর্যে একদিকে চিহ্নিত হয়েছিল অলোকরঞ্জনের প্রয়াস, অন্য দিকে ঋদ্ধ হয়ে উঠছিল আমাদের কবিতা।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে যখন সংযোজন করছেন বিভাব-কবিতা, তখন তিনি আরও বেশি প্রত্যয়ী, সপ্রতিভতায় আরও মসৃণ। এখানে তিনি ভেঙে ফেলেছেন ছন্দের মোড়ক, উঠে দাঁড়িয়েছেন গদ্যের ভূমির ওপর, কিন্তু এমন সে গদ্য যাকে কবিতা বলে ভ্রম হতে পারে প্রথম নজরে।—

এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।
তুমি এক থেকে দশ গোনো আমি তারি মধ্যে দেবো তার মাথার মুকুট,
সূর্যের সম্মান, লক্ষ কাশফুল, আপন অস্তিত্ব থেকে প্রাত্যহিকতার অন্ন....

আর নির্ভীক আস্থায় যখন তিনি স্বেচ্ছাচারে ওই কবিতাতেই তৎসম শব্দের সঙ্গে অশিষ্ট ভাষার এক মনোজ্ঞ মেলবন্ধন ঘটান, 'বুঝেছি, ভেবেছো আমি ওকে শুধু নির্বস্ত্রক গরিমা দিয়েই ধাপ্পা দেবো', তখন আমাদের চোখ চলে যায় ওই গ্রন্থেরই আর সব কবিতার দিকে। আমরা হাতের মুঠোয় পেয়ে যাই সমমেজাজী আরও কিছু দৃষ্টান্ত—'নিভন্ত সূর্যকে উস্‌কে দিয়ে', 'আকাশসর্বস্ব ছাউনিটাতে হিড়হিড় করে সে আমায় আমন্ত্রণ করে', 'বহির্দ্বারে তোমার বেবি ট্যাক্সি উঠল বেজে', 'শ্রমণ বুঝতে পারলে যাচ্ছেতাই হবে', 'থার্ড ক্লাসের মূন্ময় কামরায় দেহাতি সাতজন', ইত্যাদি।

১৯৬৯-এ 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র বিভাব-কবিতায় আবার তিনি ছন্দকে মান্য করে নিলেন। কিন্তু এবার ছন্দ পেশ করা হল একই কবিতার কলেবরে দু-রকম বিন্যাসে। প্রথম স্তবকে,

মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালোবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
হাফ-আখড়াই গাও

দ্বিতীয় স্তবকে এসে নিখুঁত ছন্দের কল্যাণেই উচ্চারণ যেন আরও ঘনতা পেল,

দেখতে-দেখতে আমি কেমন প্রিয়তমার বুকের নিচে
আলোর প্রজাপতির পাশেই স্পর্শপ্রবণ পুতুল শোয়াই,
কতো সহজে আমার শরৎ চৈতালির আষাঢ়ে ভিজে
দিগ্বিদিকে ফেরার হলো। এবং ভগবানের দোহাই।

এই সঙ্গে বিষয়ভাবনায় অন্বিত হল ঈশ্বরের নানা অনুষঙ্গ : 'আমার বিষণ্ণবস্তু, ঈশ্বর।'—

১. নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে-নাছোড় ভগবান — নির্বাসন
২. 'কী বোঝো তুমি, ঈশ্বরের ভাড়াটে সন্ন্যাসী ?' — পুরোহিতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর
৩. অভুক্ত দেবতার অঘোর আপেল চিরে রক্ত
আমি সইতে পারছি না। — রক্তাক্ত ঝরোখা
৪. ভগবানের নিজের ঈগল
তারো ডানার যন্ত্র বিকল — " "
৫. বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয় — " "
৬. সে-পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যথায় একাকী — চামুণ্ডা

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র আগের বছর ১৯৬৮-তে 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ' এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। দশটি কবিতার গ্রন্থনায় এই যে একটি শীর্ণ সমাহার, তারও প্রাক্‌বচনে রইল একটি একাদশী বিভাব, একটি নামহীন উদ্দীপন-ভাবনার বীজাংকুর, অনুষঙ্গসূত্রে যেখানে স্পর্শিত হল ভালবাসা, অপমান, ছলনা, আর 'যে-অসতী ফোটায় টগরফুল নিজের গরজে, / যে-অতিথি পিঠের পিছন থেকে ঘর ভাঙে, / যে-নারী শিশু ভাঙিয়ে ভিক্ষা চায়।' পঙ্‌ক্তিনিহিত ভাবনাগুলিই সম্প্রসারিত হতে থাকে অন্তর্গত কবিতামালায়, যা ছিল এক-একটি ছত্রের ঋজুতায়, তাই যেন প্রসারতা পেতে থাকে ক্রমিক গুচ্ছ উচ্চারণের বিভিন্ন মাত্রায়,

বিগত নারীর মুখ
অভিনেত্রীর ভঙ্গুর মুখে ভেসে ওঠে — অহরহ সুখ

মুহূর্তে ভেবেছি আমি চারদিকে দেয়াল তুলে দেব
ভালোবাসবার — নারীর নিজস্ব

ওদের মধ্যে অন্তত দুই ঘর
দেশান্তর ভালো — দম্পতি

হুবহু বিবাহিত তিনটি লোক
অবিবাহিত থাকে দিনে — ভুক্তভোগী

ওরা সবাই মশাল জেবলে দুপুর বেলায়
এ-ওর মুখে নানা রকম মুকুর হেলায়
এ-ওর উপর খেয়ালখুশির কুকুর লেলায়,
মেয়ে তো নয় কয়েক গুচ্ছ প্রবঞ্চনা.... — আমাকে তবু তুমি অবিশ্বাসী হতে বোলো না

১৯৭৩-এ 'ছো-কাবুকির মুখোশ' যখন প্রকাশ পাচ্ছে, তখন উচ্চারণে প্রবর্তিত হল অন্যতর স্বরব্যঞ্জনা। সংযোজন ঘটল অতিরিক্ত কোনও পুরাণের নয়, কবিতা তখন হয়ে উঠছে 'নিজেই নিজের পুরাণ', কিংবা 'নিজেই নিজের মুহূর্ত'। ১৯৭১-এ জার্মানিযাত্রা, তার দু-বছর পরে এই পথের সঞ্চয়। দেশান্তরের পরিক্রমা পুষ্টি জোগাচ্ছে তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'ম্যান্ডোলিন' থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে 'সুরসংগতির গূঢ় অতুলপ্রসাদ', সহাবস্থানে ধরা দেয় 'চন্দনকাঠে নির্মিত হাত' আর 'গথিক গির্জে', 'অহং খুশি'-র পাশে উঁকি দিয়ে যায় 'সবুজ দুর্ঘটনা', 'আরোগ্য ভোরবেলা'র পাশে দেখি 'রুগণ হবার' প্রতীক্ষা, 'একফোঁটা মেয়ে তিলাঞ্জলি' কয়েক পঙ্‌ক্তি ছাপিয়ে হয়ে ওঠে 'যীশুর দুলালী ঐ মেয়ে।' প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 'অলীক সীমান্ত' ক্রমে চূর্ণ হয়ে যায়, মৃদু পক্ষপাতে ভেঙে যায় 'কৃত্রিম প্রাচীর'। ঠিক এই বিপ্রতীপ অনুষঙ্গ-ভাবনাগুচ্ছ থেকেই উঠে আসছে 'ছো-কাবুকির মুখোশ'-এর বিভাব কবিতাটি, তার দুটি অনবদ্য স্তবক,

তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে
অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছো-কাবুকির ছদ্মবেশে....
২
উত্তর অতলান্তিকে বৃষ্টি হলে
তোমার-এখানে কেন রৌদ্র হবে
জানি তুমি ডোরা কাটা স্বাতন্ত্র্য কায়েম রাখবে বলে

থেকে-থেকে কীরকম অচেনাসমান হয়ে যাও
এমনকি কেঁপে ওঠো তোমার ডানায় যদি হাত রাখি

নারীর চিরাচরিত প্রতিমায় বদল এল, গতিময়তার সঞ্চার ঘটল অন্যতর বিদেশী বাতাবরণে : 'তুমি নারী ট্র্যাক্টর চালিয়ে এলে গমখেত থেকে আঙিনায় / বীজগম নেবে বলে' কিংবা, 'নারী তুমি কৃষিসভ্যতার মাতা সভ্যতার সংকটে আবার / তোমাকে দিয়েছি ভার সবুজ বিপ্লব থেকে আরো / সার্থকতা আমাদের দেবে বলে' (ট্র্যাক্টর চালাও নারী, ট্যুবিঙ্গেনে)। এই সঙ্গে সম্ভবত নতুন আদলে শুরু হল অলোকরঞ্জনের সম্মুখবর্তী কবিতাকৃতির নিরীক্ষা-অধ্যায়।

ছন্দে-মিলেই গ্রথিত হলো 'গিলোটিনে আলপনা' (১৯৭৭)-র সূচক কবিতা 'জ্বর', সাত লাইনে আয়োজিত রইল এর উদ্দীপন-বিভাব। মৌল মেজাজ ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠল ছোট্ট একটি সমীক্ষণে : 'সাঁওতালডি-র আলোকমালার অতীন্দ্রিয় ছল।' হয়ত বা এরই সূত্রে অন্যান্য কবিতায় অঙ্কুরিত হল 'চলন্ত দেয়ালি', 'অনিকেত নৌকার দীপিত রশ্মিগুলি', 'কার্বাইড-আলো', 'শহর ধুঁকছে কারা যেন আমার মধ্য দিয়ে টেনে নিচ্ছে প্রাণদ অমাজান', 'একটু দূরে পিদিম হাতে পাতালরেল চলে', কিংবা 'তবুও জটার মধ্যে জোনাকির বিকিকিনি বাড়ে', অথবা 'এখন বাড়িতে যেতে দেরি হয় সারা রাস্তা সাপ-লুডো',—শহরযন্ত্রণার টুকরো চলচ্ছবি। আর এই নিঃপ্রদীপ নাগরিকতারই চূড়ান্ত নিরুপায় পরিস্থিতি জেগে উঠল একটি মিতবাক কবিতার দুটি স্তবকের অবকাশে,

বিদ্যুতের হঠাৎ-অভাবে
অজিতেশ (ক্রেয়ন) কেয়া (আন্তিগোনে) সংলাপ থামিয়ে দিয়ে
নগরপ্রান্তরে এক অন্ধকার মাপে
'কেন এত অন্ধকার' 'আরো কতোক্ষণ এই অন্ধকার'
একাকার দর্শকসত্তার
জিজ্ঞাসার মাঝখানে কারা যেন মঞ্চে উঠে গিয়ে

জেবলে দিল কয়েকটি মোম, তার সংক্ষিপ্ত আগুনে
ক্রেয়নের উত্তরীয় জবলে যায়, অগ্নিকাণ্ডে ঘৃতের আহুতি
আন্তিগোনে। — আন্তিগোনে মঞ্চ : কলকাতা

বাড়ন্ত বিদ্যুতের উল্লেখ থেকেই 'প্রতিবিধান' নামাঙ্কিত একটি কবিতা রচিত হয়েছিল পরবর্তী বছরে প্রকাশিত 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' গ্রন্থটিতে, আর সেখানেও ছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষের সংকেত : 'এ একরকম ভালো—/পৌর পিতা, অতর্কিতে / নিভিয়ে দিলে আলো'। কিন্তু বইটির কেন্দ্রিক মেজাজ এখানে ছিল না, এবং অলোকরঞ্জনীয় প্রথামত বিভাবিতও ছিল না এর উদ্বোধনী পৃষ্ঠা। সূচক কবিতাটি স্থান পাচ্ছে মধ্যপর্বে, ছন্দে, অনামী পরিচয়ে, বেজে উঠছে মন্ত্রের মত, শ্লোকের মত,

স্তোত্রে ভরেছি শিশির
শিশিরে ভরেছি স্তোত্র
এ নাকি দিবা ও নিশির
মতন খুব স্বতন্ত্র....

শিশির-দিবারাত্র-প্রভাত-নিশীথের এই নৈসর্গিক আনুষঙ্গে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আসে ১৯৮২-র 'জবাবদিহির টিলা'-র বিভাব গদ্যায়নে। প্রকৃতি সময়ান্তরে অর্জন করে নেয় মহত্তর কিছু মাত্রা, 'মানুষের আনন্দের স্রোতে' জেগে ওঠে কবির ঘুমন্ত অভিলাষ, 'আত্মদানে আর পরিচর্যার জগতে' তিনি অন্বেষণ করে বেড়ান অস্তিত্বের অর্থ। যে প্রাকৃতিক ফুলের গায়ে শৃঙ্খলার নামে তার নাম লেখা আছে, লেখা আছে দাম, প্রাপকের পরিচয় এবং ঠিকানাও, যেখানে নথিভুক্ত হয়ে আছে প্রজাপতি তার ডানা নিয়ে, তাতে তাঁর আজ আর কণামাত্র সম্মতিও নেই। ঠিক এই নির্দিষ্ট প্রবণতাই জাগিয়ে তুলছে এই গ্রন্থের 'বিভাব' কবিতাটিকে :

আর আমার কোনো নিসর্গ নেই, মানুষজন যখন ঘুমিয়ে পড়ে
আপাতমৃত লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে অনুভব করি
অনন্ত নিসর্গের আস্বাদ যেন দেবদারুর দূতীরা ঢেলে দেয় আমার
মুখে অমৃত আঃ আমার ঘুম পায় আর দু'দিকে খাটিয়া
পেতে ঘুমিয়ে থাকে কাতারে-কাতারে নরনারী তাদের
মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার পথটাই আজ আমার নিসর্গ

প্রকৃতি অতিক্রম করে এই মানবায়ন, নিসর্গ ছাপিয়ে নিসর্গতর লোকালয়ের মধ্যে তাঁর এই হেঁটে যাবার পথ, কবিতাকে আজ জাগিয়ে তুলতে খাটিয়া-পেতে-ঘুমিয়ে-থাকা নরনারীই তাঁর সময়োচিত উপচার।

১৯৮৩-তে 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'। এবার তাঁর ঘরের মধ্যে 'প্রাতিভাসিক নিজস্ব পৃথিবী', এই পৃথিবীর দিকে একান্ত অভিযাত্রা। গ্রামগঞ্জের স্মরণ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে, বুড়ো নিমগাছ মনে করিয়ে দেয় পিতামহের পদবী, অনুষঙ্গ ছাড়া এখন আর-কিছুই মনে আসে না, 'বন্ধু শুধুই হয়ে ওঠে বন্ধুজনোচিত'। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'-র 'যে-রাখাল দূরদেশী' কবিতায় ঘনায়মান গোধূলিলগ্নে ট্রামে ওঠবার আগে কে যেন তাঁকে বলে উঠেছিল 'এবার কিন্তু আঙ্গিক বদলান'। শহরের পাঠভেদে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, ছিল বিরূপতা আর ক্ষোভও। সেই ক্ষোভ 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'-র বিভাব কবিতায় আত্মধিক্কারে রূপান্তরিত হলো।

সব-কিছু অবহেলে
শিল্পের দিকে সঁপেছি আমার মন।

গ্রন্থান্তরে এই পোশাক বদলের আকাঙ্ক্ষা, ফেলে-আসা দিনকে সংশোধন করে নতুন করে শুরু করার প্রবল প্রয়াস, প্রাক্তন প্রকরণের পরিমার্জনায় কবিতার শরীরে নতুন সুস্থতার সঞ্চার,

আমি এবার সেরে উঠবার আগে
একটু বেশি সময় নেবো।
যেন এবার সেরে উঠবার পরে
অসুখ না হয় আর।
.....
থমকে-থেমে রুগ্ন কবিতার
সংগ্রহ তৈরি করছি, এক-এক স্তবক অনুবাদের পর
আমার ভাষায় তেজিয়ান দেখাচ্ছে। অসুখ

এর পরে দশ বছরের প্রসারতায় আরও চারটি বইয়ের আত্মপ্রকাশ। '৮৫, '৮৮, '৯১, '৯৩-তে প্রসূত হচ্ছে যথাক্রমিক 'ঝরছে কথা আতস কাঁচে', 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' এবং 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ'। এর মধ্যে 'বিভাব'-বিহীনতায় তৃতীয় গ্রন্থটি একমাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বাকি তিনটির শেষোক্ত দুটি-তে সংযোজিত হয়েছে দ্বিপর্যায়িক দুটি করে বিভাব-কবিতা। 'ঝরছে কথা

আতস কাঁচে'-র উদ্দীপনী উচ্চারণ ছন্দ-মিলের গ্রন্থনায় দশটি চরণে পরিবেশিত। সেখানে 'বেলায়' যেমন সমীকৃত হয়েছে 'খেলায়'-এর সংবাদে, তেমনি অগতানুগতিক প্রান্তিক মিল 'শুধু' এবং 'খধূপ' অলোকরঞ্জনকে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করেও দেয়। আর শেষ ছত্রে সেই মিতাক্ষর কবিতায় মুদ্রিত থাকতে দেখি এক গোপন সংকল্প : 'বাচাল শব্দ পুড়িয়ে দাও'। পূর্ববর্তী আঙ্গিকসম্পর্কিত কথারই অনুরণন যেন। আবার একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াতে দেখি কবিকে, অবাঞ্ছিত শব্দকে খসিয়ে দিয়ে আরও টান্‌টান্‌ অব্যর্থতায় এগিয়ে যান তিনি এক-একটা উচ্চারণের দিকে, একটু যেন অনায়াস হতে চান ভাষামুদ্রা নিয়ে, 'অমোঘ দুর্জ্ঞেয়তা'কে যেন তিনি আর প্রশ্রয় দিতে চান না প্রাক্তন অভ্যাসবশে। নিজের বাচনভঙ্গি আর প্রকাশরীতির মধ্যে সহজতার সঞ্চার করতে যেন তিনি আজ আরও একটু উদ্‌গ্রীব : '....আমারও / দোষ কম নয়, এরা জানে ভেবে অসংখ্য কথা / লুকিয়ে রেখেছি টেবিলের নিচে, তাদের অনুক্ত / ছায়ায় প্রচ্ছন্ন রেখেছি—আমার বর্জিত সেই / সমস্ত কথা যদি এখন ফিরিয়ে আনতে পারতাম / এরা আমাকে বুঝতে পারত' (গ্রহণবর্জন)। পাঠকের প্রতি এই দায়বদ্ধতা তো যে-কোনও লগ্নে যে-কোনও কবিরই অভীপ্সিত। একই সঙ্গে পরবর্তী গ্রন্থের 'বলতে বলতে' কবিতাটির দিকেও আমার চোখ চলে যায় যেখানে তিনি আরও অনাড়ম্বর হওয়ার জন্য জ্ঞাপন করতে চান তাঁর ঐকান্তিক প্রত্যাশা : 'তবে কি তাঁর মতো / বলতে পারব দুরূহ সব কথা / সহজ সরল করে?'

কালান্তরে অলোকরঞ্জনের এই বোধ আমাদের এক বিরাট ঝাঁকুনি দেয়, আমরা টের পাই। একটু যেন সংশয় মুহূর্তের জন্য বিচলিত করে ফেলে তাঁর যাত্রাপথ : 'চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, একটু পরেই / চলতে থাকি, দ্বিধা ও গতি মিশে এখন / আরেকরকম ছন্দ জাগে' (গোধূলিময় একটি যুগল)। ১৯৮৮-তে 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', বিভাব কবিতা দিয়েই শুরু এর প্রাথমিক ভাবনাক্রম। ৪৪টি কবিতার অবসানে সেখানে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাপরম্পরা, এবং তার সূচনাতেও সংযোজিত হচ্ছে আরেকটি বিভাব-গ্রন্থনা। দুটি কবিতারই ভাবনাপটে গার্হস্থ্য মেজাজ তৈরি করছে অন্যতর চরিত্র। প্রথমটির অন্তর্বয়নে ভিড় করছে 'বাড়িঘরের মজ্জাগত ইঁটসুরকি', 'ছন্নছাড়া ধুনুরি', 'গৃহকর্তা', 'ঘরবাড়ি দরদালান' 'পেঁজা তুলোর পুঞ্জরাশি', আর এক ঝলকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'দেহই নাকি গেহতত্ত্ব?' দ্বিতীয় বিভাব এই 'গেহতত্ত্ব' থেকেই বুঝি খুঁজে নিচ্ছে অন্য এক ঈশ্বরীয় অনুষঙ্গ :

এখন বাড়ির ছায়া বাড়ির উপরে ভেসে থাকে।

একবার ভুল করে যদি ছাদে যাও দেখতে পাবে যতো
দেবতারা শরণার্থী

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' এই রবীন্দ্র-উচ্চারণে একসময়ে উৎকর্ণ হয়েছিলাম আমরা, দেবতাকে মানবিক উষ্ণতায় এভাবেই অন্তরঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিল একদিন মানুষ; আর আজ অলোকরঞ্জনীয় দর্শনে বাড়ির বৈকল্পিক জাহাজের পাটাতনে 'দেবতাত্মা এবং মানুষ জায়গা বদল করছে, একই জার্সি'। তৃষিত দেবতাই যেন আজ মানুষের আশ্রয়প্রার্থী,

মানুষের বাড়ি

আগেকার মতো আজ ততো কিছু পাকাপোক্ত নয়।
মানুষ, এখন তুমি সর্বব্যাপী ধ্বংসের প্রেক্ষিতে
তবু ধরে নিতে পারো প্লাবনে তোমার বাড়িটার
জলছাদ আরো-এক গাঁথনি পায়, তবে সেখানেই
জলসত্র খুলে দাও, দেবতারা মেটাক পিপাসা।

আপাতত তাঁর শেষ বই 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ', প্রকাশিত ১৯৯৩-এর সূচনাপর্বে। আগেই উল্লেখ করেছি এখানেও 'বিভাব' কবিতা একটি নয়, দুটি, এবং উভয়েই ছন্দে গ্রথিত, মিলাশ্রিত। প্রথম কবিতায় একটি ঘুমন্ত আকাঙ্ক্ষাকে অনুবাদ করে শোনাতে দেখছি তাঁকে : 'পিলসুজটাকে বাঁশী করে যদি বাজানো যেত'। দ্বিতীয় স্তবকে আরও একটি বাসনার সাঙ্গীতিক মূর্ছনা, 'আমি তবু চাই ভোরের রাগিনী' বলতে-বলতে / 'রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এসো গুর্জরী টোড়ি'। আর শেষতম ছত্রে এক উদাসী নিরাসক্তি : 'বলে বাঁশীটাকে ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে....'। দ্বিতীয় 'বিভাব'-কবিতায় ১৪ লাইনের অবকাশে উঁকি দিয়ে যায় পূর্বতন অলোকরঞ্জনের শিল্পিত বিভা, তাঁর আপন প্রকরণশৈলী, অপ্রচল শব্দের প্রয়োগ-প্রবণতা আর অনুপ্রাসের অনুপম অনুরণন। এই কবিতাটির জন্য, পাঠক হিসেবে মনে করি, আপাতত স্থগিত থাক আমাদের সমস্ত ব্যাখ্যা, স্তব্ধ থাক যাবতীয় সমীক্ষণ, বরং বিনিময়ে উদাহৃত হোক এর সামগ্রিক নির্মাণ, আমরা সনিষ্ঠ পাঠে শুধুমাত্র ছুঁতে চেষ্টা করি এর অন্তঃশীল উদ্দীপন-ভাবনাকে,

হলুদ সুনীল হেলিওট্রোপ ছাই ধুতুরা সবুজ সামন্তক
পেরিয়ে এলাম বর্ণের সপ্তক

অ্যালার্ম-ঘড়ির মধ্যে ছিল গচ্ছিত এক সময় সায়ন্তনে
অন্ধ চোখে চুম্বিত চন্দনে

কে দিল এই অনুশাসন : তুলসীপাতা মৃতের দুই নয়নে
রাখতে হবে—সে কোন্ ক্ষপণক ?

অধিবাসের আগে হঠাৎ কান্না নিয়ে বিজন সেতু দেখে
জয়িতা ঐ ফিরছে, সঙ্গে কে

জানি না আমি এটুকু শুধু বলতে পারি খণ্ডপ্রলয় থেকে
মশাল জেবলে আমার আমন্ত্রণে

অংশ নিল এখুনি ওরা, দুধকুয়াশায় দেখুক এইবার
থমকে-থাকা কুমুদবহ্যার

আরো দেখুক চলার পথে রেখদেউল মেঘের রক্ত লেগে
ভেসে উঠল প্রসন্ন উদ্বেগে

নামহীন এই 'বিভাব'-গুচ্ছে অলোকরঞ্জনের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের সূচনায় প্রথাকবিতা। এগুলির সঙ্গত সূত্রপাতেই শুরু হয়েছে তাঁর উচ্চারণের আচমন, গ্রন্থে নিহিত বিষয়ভাবনাকে আলিঙ্গন করে গড়ে উঠেছে এই নান্দীপাঠ, শুভবোধে পৌঁছে দেবার তাগিদ থেকে বেজে উঠেছে এই মঙ্গলাচারণ। এদের উদ্বোধনী ভূমিকা প্রস্তাবিত হয়ে গেছে সমগ্র গ্রন্থের অন্তর্ভাবনায়। তাঁর পাঠক তাই মৌল কবিতায় অনুপ্রবেশের আগে অভ্যস্ত মেজাজে তাকিয়ে দেখেন এই বিভাব কবিতা-গুলিকে, দেখেন উদ্গ্রীব উন্মুখতায়, যেখানে বাকি সমস্ত নামাঙ্কিত কবিতার সঙ্গে এই অনামী উচ্চারণগুলি গ্রথিত হওয়ার পর অলোকরঞ্জন তাঁর কবিকৃতি নিয়ে অন্যতর প্রেক্ষিতে চরিত্রবান হয়ে উঠছেন আমাদের কাছে।

বৃত্তিবদল

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এখন শুধু হোমগার্ডের হাতে-হাতেই ঘুরে চলছে গোলাপ।
এবং প্রেমিকেরা
জরাগ্রস্তদের
পার করে দেয় জটিল রাস্তা।
কবিরা আজ তাদের পরিভাষা
শমিত করে ঘুরে আসুক ভূমিকম্পে দুর্গত এলাকা—

ততক্ষণে হোমগার্ডের হাতে-হাতেই ঘুরে চলুক গোলাপ।

খাতা কলমের দেশ

দেবারতি মিত্র

খাতাকলম নিয়ে বসলেই
মাঝখানে কে এসে বাতাস নাড়া দেয়,
শূন্য থেকে অনেক নীল অনেক শিহরণ—
যাকে ডাকি সে আসে না।

পড়ো জঙ্গলে আসশ্যাওড়া ভাঁট বুনো মানকচুর ঝোপ কেটে
গর্জিয়ে উঠল ঘোমটাউলির বাড়ি—
আরবেলের দিদা এসেছে ! আরবেলের দিদা এসেছে !
দু-একটা দিন থেকে যাবে নাকি ?
একটু দাঁত উঁচু, গালে পান, হাসি হাসি মুখের আদল
ফুটে উঠতে গিয়েও ধানবনের ছায়ায় মিশে যায়—
নারকোল নাড়ুর গন্ধ, তুলসীচন্দন,
বিকেল বিকেল মন কেমন।

ছুঁচে যতক্ষণ না পরাতে পারে
হাত উঁচু করে বসে আছে বিনকি
কখন আসবে ভেসে সরু সরু সাদা মেঘ।
বুনে ফেলবে বিছানার চাদরে
সাগরের ঢেউ, সমুদ্রের ফেনা।
বৃষ্টি নামলে কি মজা!
একছুটে চলে যাবে দিগন্তের জানলা খুলে
দেশে বিদেশে মনে।

কুয়াশার কোণে প্রায় ঘাড়-নেই ড্যাবড্যাবে চোখ
ধপধপে তিনমাসের খুকি ফুলটিকির পাখির ডাকের মতো
হাওয়ার বুকে ঘুমিয়ে পড়ল এইমাত্র।

খাতাকলম নিয়ে বসলেই
অনেক ঝরঝর সরসর
অনেক নীল অনেক শিহরণ—
যাকে ডাকি সে আসে না।

পেশা

রণজিৎ দাশ

আমিও সুন্দরবনে
মধু-সংগ্রহকারী....বাঘ ও বিপদ
আমার পিছনে আছে, আজীবন
আমি শুধু গাছ থেকে গাছে
খুঁজে ফিরি নীরবতা, অশ্রু ও মৌচাক

সন্ধ্যা হলে ফিরে আসি
শূন্য হাতে ; বনরক্ষী, মদ
এড়িয়ে, তোমার স্তব্ধ উঠোনের অন্ধকারে
মাথা নিচু করে বসে থাকি।

বিশাল রাত্রির নিচে শুয়ে-থাকা নিরীহ জন্তুর
রোমশ নিঃশ্বাস ছাড়া আর সব কিছু
অবিশ্বাস করো তুমি, সব কথা, স্বপ্ন ও রূপক।

আমিও বলিনা কিছু।
শুধু জানি—বাঘ ও বিপদ
আমার পিছনে, তাই নক্ষত্র-শিকারী
সময়ের একপ্রান্তে, একদিন, বিগ্নিত সন্ধ্যায়

জঙ্গলের দুঃসংবাদে, অবিচল ব্যাঘ্রবিধবার
মর্যাদা তোমারই।

ঢেউগুচ্ছ

জয় গোস্বামী

আমাদের নীল মৃত্যুকাল
আমাদের সাদা সন্তরণ
আমাদের ঢেউগুচ্ছ

আমাদের এই ভীরু জীবন
জলে ফেলে দেওয়া শান্ত ঢিল
ক্ষমাশীল ঢেউগুচ্ছ

গায়ে গায়ে ঘষা কালো জীবন
হাতে মুখে হাতে মেখে নেওয়া
ঈর্ষার কাঁচা রক্ত

আমাদের এই আলো জীবন
কারো কাছে কিছু নেবে না আর
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শান্তি

আমাদের এই ভাঙা জীবন
পড়োশীর ঘর আলো করা
কচিকাঁচাদের দঙ্গল

আমাদের নীল মৃত্যুযান
আমাদের সাদা সন্তরণ
টেনে নেয় ঢেউগুচ্ছ

আমাদের এই চিরজীবন
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করা
বন্ধুর মতো বন্ধু

আদালত

ব্রত চক্রবর্তী

হলফ করে বলছি
আমি খুন করিনি সুন্দরকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যখন ঘাতক
আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র।

বর্শাফলককে জিজ্ঞেস করুন, ধর্মাবতার,
খোঁচা নিয়েছি বুকে, পাছে
ধার নষ্ট হয় তার।

সুন্দর একাকী ছিল, আমিও ;
কিন্তু দাবি বদলে গেছে তার।
যুগধর্মে পা, দাঁতে লোভ,
ঠিক আমাদের মতো পরশ্রীকাতর,
টুঁটি টিপে বলল বন্দনা গাইতে যেই,
শিরা কেটে দিয়েছি বাহুর!

জ্যোৎস্না

সুবোধ সরকার

কোন মেয়ের কাছে আমার দুঃখ করতে ভালো লাগে না
মেয়েরা কয়েকশ' বছরের দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে পৃথিবীতে আসে।

মা রাত জেগে বসে আছে, সারারাত কাশছে
আমার দুঃখের কথা তোমাকে বলতে চাই না মা, আমি ঠিক আছি।
আমার বোন পথ চেয়ে বসে আছে তার স্বামীর অপেক্ষায়
আমি জানি তার স্বামী ফিরবে না
বোন, আমি তোকে কি করে বোঝাবো আমি তোর যোগ্য সহোদর
এখনো হতে পারিনি।
রিপন স্টিটের চোদ্দ বছরের বাচ্চা মেয়েটা
সানগ্লাস পরে, আমার সামনে এসে দাঁড়াল
বললো, 'ফাক্ মি আংকেল'
আমি আর কোন ভাষায় তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

কয়েকশ' বছরের দুঃখের বোঝা নিয়ে এই মেয়েটি এসেছে
বাবা অন্য নারী বিয়ে করেছে
মা আছে আরেক পুরুষ নিয়ে তারই পাশের ঘরে
যে ছেলেটির সে বন্ধুত্ব চেয়েছিল
সে তাকে দ্বিখণ্ড করে চলে গেছে মারুতি চালিয়ে।

কলাপাতার মতো ঝলমলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো
আমি তাকে সারা সকাল, সারা দুপুর, সারা বিকেল
আমার দুঃখের কথা বললাম, যা আমি বলি না
সূর্যাস্তের পর সে তার ব্লাউজ খুলে দেখালো
বাঁ দিকের স্তন, একেবারে পোড়া, আমি মুখ সরিয়ে নিলাম
গত বিজয়া দশমীর রাতে স্বামী অ্যাসিড ঢেলে পালিয়ে গিয়েছে।

কয়েকশ' বছরের বোঝা নিয়ে মেয়েরা জন্মায়
যে সব মেয়েরা জ্যোৎস্নায় নদীর দিকে বেড়াতে যেতে চেয়েছিল
এখন তারা কোথায় ?
আমরা চন্দ্রভুক পুরুষ তাদের নদী দেখিয়ে এনেছি
কিন্তু জ্যোৎস্না দেখতে দিইনি এখনো।

বিনিময়

অনিতা অগ্নিহোত্রী

তোমাকে শোনাবো টিউলিপ আর পাইন পাতার গান
বাসনা বিধুর নার্সিসাসের আঁধারে জাগার কথা
তুমি কি পাঠাবে মহুয়া-ঝরার, বটের ফলের ঘ্রাণ
চাঁদ নিভে যাওয়া শাল-বনানীর ছবি ?

কতোদিন হ'ল ডুব দিই নাই জ্যোৎস্নার পারাবারে
কতোদিন হ'ল ঘেরেনি আমায় পাতা-ঝরা নীরবতা।

এ-আকাশ থেকে ও-আকাশে ছুটে দেখেছি সূর্য ডোবে
তারা ফুটে ওঠে হ্যালোজেন-নভোলোকে
দেখেছি সাগর রং বদলায় কালো থেকে নীল, লাল
দেখেছি বাতিল পোত ফিরে আসে উদাসীন বন্দরে।

সন্ধ্যার তীরে হলুদ-গাঁয়ের মুখে সে প্রেমের সাঁকো
দূর আলোখানি, ঘুম ভেঙে মনে পড়ে।

তোমাকে দেখাবো খাঁড়িতে সাগর ভেঙে পড়ে কোলাহলে
দেখাবো প্রপাতে রামধনু রং, তুফানে অন্ধবন
দীঘল হ্রদের নীল জল, তীরে বরফ-ধারালো চূড়া
পাহাড়ের সারি, দেখাবো মেরুর তারা।

তুমি কি পাঠাবে কলেফুলের সকাল, বাঁকানো ভুরু
খর নদীটির ছলকে ছলকে গাগরী দুলিয়ে চলা।

কতোদিন হ'ল মুখে রোদ লেগে উঠি নাই ঘুম ভেঙে
কতোদিন হ'ল ঘুম আসে নাই, বসে আছি আলো মেখে।

না-গাওয়া গানের মতো

অমিতাভ গুপ্ত

(প্রয়াত অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আশু বিশ্বাস রোডের যে-ঘরটিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই গল্প করতে আসতেন, সেই ঘরটিতে ব'সে সেদিন—১৮ জুন ১৯৯৩—বর্তমান লেখকের পালাগান 'লীলা' পড়া হল। বিভূতিভূষণের প্রেরণানির্ভর সেই 'লীলা', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক চক্রবর্তীর স্ত্রী ও কন্যা শুনলেন। তাঁরা বিভূতিভূষণকে খুব ভালো ক'রে চিনতেন এবং অতিদীর্ঘ 'লীলা' তাঁদের কাছেও অস্বস্তিকর হয়নি। এ'রচনাটি সম্পর্কে সাধারণ ঔদাসীন্য ভুলে গিয়ে বর্তমান লেখক ওই সন্ধ্যার স্মৃতিকে শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন আর, ১৮ থেকে ২১ জুন, দিলীপদার দেওয়া ডায়েরিতে এখানে মুদ্রিত এই কয়েকটি পংক্তি লিখে রেখেছেন। বলা বাহুল্য, 'লীলা'য় কিংবা 'মায়া' বা 'প্রমে' যে-অন্যতর পাঠসংহতির সন্ধান ছিল, এইসব পংক্তিনিচয়েও তার প্রতিফলন ঘটে গিয়েছে। তবু এই এলোমেলো রচনাপ্রয়াসটিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল)

পুরোনো কাঠের গায়ে সবুজ দাগের মতো
ভালোবাসা
পুরোনো মানুষ কাঠ কেটে
রেখে গিয়েছিল
সেও তো শান্তি-পাওয়া
অনেক বলার মতো
সেও তো মৌনের

সমস্ত হাসির মতো মৃদু
অশ্রুর মতন বিধুর

এক-একটি অসম্পূর্ণ কুঁড়ি
তাকে যদি কখনো কুড়িয়ে
এনে, ফুলেদের সব হাসি
দেখে মনে হয় ভালোবাসি
এ'বাগান, এই ফুটে-ওঠা

কীভাবে এতদিন পরে যে-ভালোলাগা
একটি ভাঙা পটে আবার ছবি-আঁকা
হয়তো পূর্ণও নয় সে' শূন্যতা
হয়তো শূন্যও নয়
কীভাবে ফিরে আসে ছন্দে, তার কথা

একটি গোপন প্রতিশ্রুতির মতো
একটি শাদা খাতা
মোমের আলোর মতো
তারই 'পরে
কাঁপছে একটি হাত

কৃতবিদ্য, তারই অরূপে
নৈঃশব্দের মতো নূপুরের
বোধ নাকি বিদ্যার মূর্ছনা
যখন সমস্ত ধূলিকণা
একটি বিন্দুই সংহত

সকল জানা-ই অপূর্বতা
হয়তো তবু প্রগল্‌ভতার
বাইরে থাকে কোন্ আজানের
সুর
মন্দ্রধ্বনির মতন প্রাণের
দূর
একটি সকল সমগ্রকে

অনেক জানার হর্ষে-শোকে
ছড়িয়ে পড়া অন্ধকারের মতো
রইল শুধু সূর্যমুখীর নত

আবার ফিরে যাওয়া
ভূমিকাটির দিকে
যখন হাওয়ায় হাওয়ায়
গভীর অনিশ্চয়ের
অন্যতর ভূমিকালিপি লিখে

কখন হৃদয়-পাওয়া যেমন ফুলের দিকে যাওয়া
যেমন সমস্ত রাত তারার দিকে তারার মতো চাওয়া
সেই চাহনির দূরনিকটে কোরকভ'রে হয়তো ঘটে
মধ্যরাতের সূর্যে যে গান-গাওয়া

প্রয়াস বলতে যদি মনে পড়ে
একটি শিশুর
হাত বাড়িয়ে দেওয়ার
ভঙ্গি
তাহলে ওই জ্যোৎস্নার মতো
রাত্রির উপরে ছড়িয়ে পড়া
বিভূতিভূষণের সমস্ত লেখা ও না-লেখা
সূর্যকরোজ্জ্বল ওই পৃথিবীর মতো
সর্বজয়াজননীর হাতদু'টিকে

বোতাম

অজয় নাগ

একজন ছুটছে, তার পিছনে আর একজন। আরও একজন তার পিছনে জলের কিনারে পাহাড়ের কিনারে। মেঘের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাওয়ার ফাঁদে—ঢেউয়ের মাথার উপর একজন দু'জন তিনজন....

ত্রিভুবন দোল খায় মৃত্যু থেকে জীবন—জীবন থেকে জীবনের
পাশাপাশি আকাশে ডুবতে ডুবতে ছয় ঋতুর দোলনায় দুলতে
দুলতে শিকড় থেকে পাতায়....

অন্য পৃথিবীর দু'হাত জন্মের সাগর পেরিয়ে ছিন্ন মস্তক—তার পাশে
অন্ধকার....তার ভিতর সারি সারি দাঁতের উপর দাঁত। উদিত চাঁদের
দেশে নষ্ট শস্য ও শব্দের সন্দেশ। হাওয়ার শূন্য-সময় ক্ষমতার চারপাশে....
প্রাণের ফানুস উড়িয়ে বাইরে থেকে আরও বাইরে শাখা-প্রশাখা
—নীচে ঘুমের তলায় কালো আলোর স্তনে চাপা পড়ছে স্মৃতির ভূগোল
—ভূগোলের গোল ঘরে জন্মায় ভয়—জন্ম নেয় দেওয়াল ও কাঁটা-
বেড়া। সারি সারি টবে সাজানো নানা রঙের কাগজের ফুল-বাহার
স্বরলিপি। পংক্তে ফোটে ছিনাল—জেগে ওঠে খাঁচা। বাজে জগঝম্প।
পাশ থেকে উপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে চাকার পিছনে ছোট বড় লম্বা চৌকো
দুঃখহরণ রঙিন বোতাম এবং বোতাম।

মরূদ্যান

প্রমোদ বসু

আমরা যেদিন ঠোঁটের কাছে,
পারস্পরিক চুমুর কাছে
মন দিয়েছি রাত্রিসুখে,
তুমি
স্বর্গতোরণ ভাঙতে এলে
শাসনমুখী আগুন জেবলে।
পায়ের নীচে শূন্য হলো
ভূমি!

কার অপরাধ বলতে পারো?—
ইচ্ছে যখন নিবিড়, গাঢ়
তখন কি আর নিয়ম থাকে

প্রেমে?
কিন্তু তোমার স্পর্ধাতে খুব
ভাঙলো ক্ষণকালের সে-সুখ,
বুকের ভেতর শব্দ গেল
থেমে।

স্বাদ জানো না, নবীন ছেলে,
উড়তে কি চাও পালক ফেলে?
আকাশ শুধু আকাশ হয়েই
থাকে?

শুকিয়ে গেছে যেদিন শুধু,
সে যদি হয় মরু-ই ধু-ধু,—
তবুও সে তো মরূদ্যানও
রাখে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠালগ্নের কিছু আগে

শুভ বসু

সব কিছু প্রায় ঠিকঠাক,

দমনের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ানো দেবীর পায়ে
দেশোয়ালী ভিলেন অসুর, নিচে মাথা কাটা মোষ
বশম্বদ সিংহটির দুর্দান্ত ভৈরব ভাব,
সরস্বতীর আননজোড়া ডি, লিট বাগানো হাসি, মা লক্ষ্মীর
স্বনামের সার্থকতা প্রকাশক দিব্য রূপখানি

দোমেটে হতেই সব জীবন্ত জীবন্ত লাগছে, শিল্পীর প্রতিভা!

এরও পরে গর্জন তেল আর তৃতীয় নয়ন,
ঢাকের বাজনা, ফুলবেলপাতা হুলুধ্বনির ভেতর
মন্ত্রে ও ধূপধুনোর গন্ধে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যাতে
পৃথিবী গভীর স্বস্তিতে মাতে, সোনার আলোক ছলবলায়!

এই লগ্ন তো 'আহা কী দেখিনু আজ এ জীবনে কখনো ভুলব না'-র।

তবু কেন ওই চালচিত্রের দিকে চোখ পড়া মাত্র
চোখে ভেসে ওঠে মাঝগঙ্গায় নৌকো,
বিসর্জনের ছলাৎ ঝুপ ছলছলছল শব্দ ?

নাসের হোসেন

১. শূন্যপথ

আকাশ ফেটে যায়, আর সেই বিশাল ফাটলের মধ্য থেকে
কি যেন এক প্রবল টান এসে টেনে নেয় মেঘের ভিতর
চারপাশে ঝিমঝিম করে ওঠে রাত, নক্ষত্রমণ্ডলী,
বাঁকানো চাঁদ—
একটা রুপোলী আভা আমাকে ঘিরে নাচতে থাকে
আমি আজও ভেবে পাই না ঘরে কে ডেকেছিল
এবং কার পায়ের শব্দে বেরিয়ে এসেছি শূন্যপথে

২. আছে

স্বপ্নের ঠিক সামনেই অপেক্ষা করে আছে
একটি কালো পর্দা
পর্দা সরালেই দেখি কেউ নেই
অথচ সে আছে, আছেই
আমি জানি সে শুধু আমার সঙ্গেই কথা বলার জন্য
সহস্রকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে

৩. মৌমাছি

কিভাবে এগোবে জীবন, এই প্রশ্নের আশেপাশে উড়তে থাকে
কতকগুলো নীল মৌমাছি
এখানে তো মধু নেই, মৌচাক তো নেইই, তবু কেন

মৌমাছি উড়তে থাকে
অনবরত বুকে মাথায় হুল ফুটিয়ে দেয়, জানুতে, পিঠে
আর আমি ঘর থেকে বাইরে বের হই
দেখি নিঃসীম বোবাধ্বনির ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছিরা
উড়ে আসছে

৪. নেমে আসে ফোঁটা ফোঁটা

এতক্ষণ যে সঞ্চরণের শব্দ শুনছিলাম
সে কার ? ছুটে যায় কে ?
আমি হাঁটি, হাঁটতে থাকি
অদূরেই তীক্ষ্ণ ছোঁয়া
বনবাদাড় জলা জঙ্গল ঠেলে
কংক্রিট দেওয়াল অ্যাসফল্ট রাস্তা
আকাশে শিশির নেমে আসে ফোঁটা ফোঁটা

হল্লা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

কী কী পেয়েছিল ওরা
সানক্রিম, আরব্যরজনীর পাতা, শাড়িফলসের রক্তদাগ
ফিরে আসবার পথে সে কী কান্না, ঝড়, সঙ্গে
উড়ে আসা তোমার চাদর, সে-ও ধরা পড়ল....
এরকম বরাবর হত
আর, চাঁদে-পাওয়া মানুষের মতো আমরা
ক্রমাগত বাড়ি বদলাতাম

মনে পড়ে দোলখেলা, গত বছরের
তারপর, চিরুনিতল্লাশের ঋতু, তবু মনে পড়ে

সময় তর্পণ

তারাপদ আচার্য

রৌদ্র নেভা বৃষ্টিদিন সরে গেলে একদা আকাশ
জেনে যাবে গোত্রনাম, জেনে যাবে জলের অক্ষর
জেগে ওঠা কতো ছবি ধুয়ে যাবে স্রোতঃস্বল বেলা।
রাগিনী আলাপ মেশা নিষ্ফল গহন পরমায়ু
একদিন নিভে এসে ভাসমান নির্জন বিকেল
শরীর নিয়েছে ঢেকে। তাপদগ্ধ গুহামুখ আমি
ভুলে যাই এ জীবন, ভুলে যাই পাতার আড়াল
শ্রাবণ জোয়ার এসে ফেলে যায় পলিমাটি, বীজ
শরীর সম্ভোগলতা ছিঁড়ে ফেলে ছুটে যায় কেউ
কুয়াশা মলিন দিন অবিরল শান্ত পাতা ঝরে
বুকজল ভেঙে তবু তুলে আনি তোমার কঙ্কাল
কাল রাতে স্বপ্নে ছিলে একখানি মেদুর বাতাস
ছিলে তৃষ্ণাতুর নীল, অপলাপে স্বরক্ষেপে ছিলে
উবু হয়ে বসে থাকা ফসিলে ফসিলে ক্ষীয়মান
রাতের প্রহরগুলি, তুমি আজ বিরল আষাঢ়
শিরায় শিরায় তুমি ভগ্নস্তূপে নগ্ন পায়ে ক্ষত
ধবল খেলনা ভেঙে স্বপ্নের ভিতরে তুমি কাল
কে দেছ অঝোর ধারে ; এমন প্রপঞ্চ চরাচর
ম্রিয়মান আছি তবু মঞ্জরিত জেবলে রাখা প্রাণ
গহন বেদনারঙ জটিল কিনারে মিশে যায়
মেঠো পথে একা বড়ো তোমার নরম ভরা চোখ
মেঝেয় মাদুর পাতা, বৃষ্টিরেখা ঢেলে দেয় ঘুম
বুননে বুননে ঢাকে অকারণ পদচিহ্ন কার !
এখানে আঙিনা নেই, নেই কোনো জানালা দুয়ার
ফিরে আসে কালবেলা ধূলিঝড় নাগরিক-ধ্বস
এখন প্রদোষ কাল, ফিরে যাবো অগ্নিময় একা

মৃদু

সুমন গুণ

আলোর মন্থর শব্দ ছুঁয়ে আছে কলোনিপাড়ার
অস্পষ্ট দেয়াল, পথ, নির্ধারিত বাড়ি ও দোকান।

একটি নির্লিপ্ত শিশু এই ম্লান পরিচ্ছন্নতায়
তৃতীয় বিদ্যুৎ টের পেল।

তারপর, বিশ্রুত শিমুলে
উচ্ছ্বসিত মণ্ড জুড়ে উড়তে লাগল, বিভিন্ন সন্ন্যাসে।

সেলাইকল

কৃষ্ণেন্দু চাকী

কবিতায় কখনও বলতে পারিনি বলে
হয়ত এক অলীক উপন্যাসের মধ্যপথে এসে
অটো ও মিনিবাসের প্রতিযোগিতা হবে
থিকথিক করবে মানুষ শ্যামাপোকাদের মতো প্রতিটি প্যারায়
প্রতিটি পাতা ঢাকা থাকবে
ধোঁয়া ও ধুলোর কালো আবরণে, ঠিক
তার নিচেই রাখবো কোনও লোভী কথাশিল্পীর দিনলিপি
বাবা সায়গলের কথাও থাকবে হয়ত
আর থাকবে কয়েক হাজার খণ্ড শিবিরের কথা
আহা ! আরও কতদিন পরে আমি লিখবো
নগরসভ্যতার সেই সুমধুর পাঁচালী
বসন্তের হাওয়ার মতো লিখে যাবো
লিখে যাবো মফস্বলের সেই সুদূর মেয়েটিকে
যে শুধুই একটি জিনসের প্যাণ্টের জন্য শুয়ে পড়েছিল
নির্জন সবুজ প্রান্তর দেখে নিয়ে

প্রান্তর থেকে দিগন্তে এঁকেবেঁকে চলে শুধু পথ আর পথ
তারই কোনও একটি একদিন শেষ হয় দর্জিপাড়ায় এসে
যেখানে ঘড়ঘড় শব্দ করে সেলাইকলগুলো দিনরাত
শুধুই ঘুরছে ঘুরছে আর ঘুরছে
দিনরাত....

খেলুড়েরা দুয়ো দেয়

শবরী ঘোষ

এ এক চমৎকার কানামাছি খেলা—
দুচোখে কাপড় বেঁধে সমানে ছুটে বেড়াচ্ছি
কাউকে না কাউকে ঠিক ছুঁয়ে ফেলব বলে ;
আর গাণিতিক পরিহাসে, আমার
বাড়ানো দু'হাতের মধ্যে এসে বারংবার ধাক্কা খাচ্ছে
এক ছাড়া,
শূন্য এবং শূন্য।

ছেলেবেলার খেলার মাঠ মনে পড়ে :
অক্ষম দুর্বল হাতে কাউকে ছুঁয়ে ফেলতে পারিনি কোনোদিন
খেলুড়েরা দুয়ো দিত
মাঠ ছেড়ে সর্বস্বান্ত মানুষের মত চলে এসেছি
সন্ধ্যের ছায়া নামা হরিতকী গাছের তলায়

আজও দৈবাৎ কাউকে ছুঁয়ে ফেললে
তাড়াতাড়ি চোখের কাপড় খুলে দেখি—
খেলবার সাথী নয় ; পথচারী রাগী ভদ্রলোক !
হরিতকী-তলায় দাঁড়াই
পাকা ফল, সর্বজয়া, ঝরে না কখনও।

খেলুড়েরা সমস্বরে দুয়ো দেয় আজও

দোর-সীমানা

বিজয় মাখাল

এক পিদিমে আঁচ উঠেছে
এক পিদিমে গেরস্ত হাড়
দুলছে বাতি রাত গগনে
মায়ের নামটি লেখাই ভার

এক পিদিমে মায়ের মুখ
অন্যটিতে শুধুই আলো
সব কালোতে বুক বেঁধেছে
আমার এবং সবার ভালো

উড়ছে ধু ধু পুড়ছে আগুন
লক্ষ্মীটি মা আর পুড়ো না—
পিদিম যদি মেঝেয় পড়ে
জ্বলবে যে ঘর, দোর-সীমানা।

প্রসঙ্গ শ্রাবণী ঘোষাল

দেবজ্যোতি রায়

সম্ভাবনা ঘুরে যাক, আমি জানি মেঘ মানে
শ্রাবণী ঘোষাল, গর্জন তেলের গন্ধ,
দেবীমুখে সম্মতির ছায়া।
প্রসঙ্গ যেহেতু মেঘ, আমি তাই
বিচলিত পেখমের কথা ভাবি

স্মারকচিহ্নের পাখি, বেড়াতে যাবার আগে
স্বীকারোক্তি কোথাও ছিল না ?

আঙুলের সাময়িক বেজে ওঠা, বিস্মিত লাটাই
ঘুড়ি নিয়ে কৌতূহল, সমীক্ষাআকাশ
এইসব স্থির তথ্য গোধূলিকে প্রভাবিত করে

সাদা চুক্তি

কাশীনাথ বসু

আর মৌখিক নয়
এবার লিখিত চুক্তি সাদা পাতা !
এখন থেকে তোমার—তোমার দিন, আমার—আমার দিন
গোটা একটাই দিন।
তুমুল প্রেমপত্রের মতো দিনরাত্রি—
তুমি হাসছো সাদাপাতা !

একটি মিটার গেজে

দীপক রায়

একটি মিটার গেজে একটি রেলগাড়ি
পেরিয়ে চলেছেই ডাকাতে মাঠখানি
পথের পাশে এক স্তব্ধ সরোবর
একটি আমগাছ একটি দেবদারু
কখনো জামগাছ ইউক্যালিপটাস
কখনো ভাঙাবাড়ি ভুতুড়ে তালগাছ

কখনো রহস্যঘেরা কয়লা রেলগাড়ি
ভোরের কথা সব রাতের কথা সব
স্তব্ধ কথা সব মাটিতে ফেলে রেখে
একটি মিটার গেজে একটি রেলগাড়ি

দেড়শ লোকজন একটি মিটার গেজে
একটি রেলগাড়ি চলেছে এঁকেবেঁকে
ঝড়ের কথাগুলি কে আর মনে রাখে
যেমন আমি থাকি যেমন তারা থাকে
সে নয় রূপকথা দূরের বাতিঘরে

একটি মিটার গেজে একটি রেলগাড়ি
পেরিয়ে চলেছেই ডাকাতে মাঠখানি
দেড়শ লোকজন একটি মিটার গেজে
তাদের কথাগুলি তারার কাছাকাছি
একটি মিটার গেজে একটি রেলগাড়ি।

শব্দ

অজিত বাইরী

শব্দ, যখনই জেগে ওঠো, বদ্‌লে যায়
পৃথিবীর রঙ ;
আমি তোমাকে নিঃশ্বাসে অনুভব করি ঃ
কখনো তুমি মাছের মতো পাখনা নেড়ে
আত্মায় ডুব দাও, কখনো আবার
উদাসীনতার খোলস ছেড়ে ঘাই দাও
মগ্নতার দূর-দিঘিতে।

ছিপ ফেলে যেমন ফাত্‌নার উপর
চোখ রেখে ব'সে থাকে মৎস্য-শিকারী,
আমি একাগ্র হ'তে চাই ;
কোন্ মুহূর্তে তুমি চারের মধ্যে ঢুকে পড়ো
আর অতর্কিতে ডোরে দাও টান !

জলের রুপোলি শস্য ডাঙায় তোলার
আনন্দে যেমন শিকারীর অপেক্ষা ও ধ্যান
ফলবতী হ'য়ে ওঠে ; আমি
অপেক্ষায় থাকি, যদি তুমি সহসা
ঝিলিক দিয়ে ওঠো ; আর আমার
আত্মার সুতোয় লাগে অদৃশ্য বন্ধনের
চোরাটান।

নির্মাণ বিষয়ক

রুদ্র পতি

কাঞ্চনফুলের মতো আমি তাকে ভালোবাসি
আধান জড়ানো স্রাবে খেলা করে মোহযানগুলি
বীজ পুঁতি আঁধারে, আর্দ্র ঋতু ; মৌসুমী বায়ুর জন্য
এই বঙ্গে আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল।

তুমি মানবী, মিথুনে যাবার আগে পুরোটাই প্রস্তুতি
লোনা-মৃত্তিকা—নিম্ন গাঙ্গেয় মন-ভূমি
এসো, এখানেই বদ্বীপ গড়ি।

এলিজি

(শংকরের মৃত্যুতে)

সুদীপ্ত মাজি

ঘুমোতে যাওয়ার আগে
ছায়া ছিল তোমারও এ মহাপৃথিবীতে।

ঘুম ভেঙে উঠে শুনি, ছবি হয়ে গেছো।

ছায়া ও ছবির মানে তুমি জেনেছিলে, শংকর ?
নুন শো-এ 'শান্তি'তে ঢুকেছো।
ম্যাটিনিতে 'সুজাতা', 'শ্রীরূপা'।
ছায়াছবি দেখে দেখে নষ্ট হয়েছিল চোখ
ভেতরের কলকব্জা, সেগুলোও এত নষ্ট হয়েছিল
ভুলেও জানোনি ?

ছায়া ও ছবির অর্থ আজ তুমি কীভাবে বুঝেছ,
খুব জানতে ইচ্ছে করে।

দাগ সম্পর্কিত কয়েকটি

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

১

এই খানে দল ঘামে
একদিন রেখেছিলো পাষাণী শরীর।
দ্যাখো, আজও দাগ রয়ে গ্যাছে।
দাগ রেখে গ্যাছে জগদ্দল পাথর
আর ঘাসগুলি শুয়ে আছে দুমড়ে-মুচড়ে ॥

২

একটি পাতায় সে শয়ন গেলে
আমি তাকে দ্বিতীয় পাতায় ঢেকে দিই
ঘুম ভেঙে দ্যাখে— সে তো পাতার সামিল,
অনন্ত কালস্রোতে শরীরী ফসিল ॥

৩

ঐখানে বসে ছিলে
বেশী আলগোছে রেখে
বালিতে
প্রথামতো চলে গেলে
প্রথামত দাগ থাকে
বালিতে

নিষ্পেষিত আমলকি

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

আমলকি বন আমলকি বন,
আমাকে ডাক দিয়েছিলি বল ত কখন ?
আমলকি বন, নির্জনতা নেই বলে আজ,
রাস্তা আমার পাশ কাটিয়ে
ছুটে মেরেছে দীঁজপাড়ায়।

আমলকি বন, গোপন বলতে
এখন আমার কিছুটি নেই।
আমার দুপুর ভাঙিয়ে নিয়ে
পাশের বাড়ির গিন্নি-ঝিয়ে
দারুণ রগড় জমিয়েছে যেই,
তোমায় ডেকে কাঁদতে যাবো—
এমন সময় পাশের বাড়ির
গিন্নিটি ওই, আমার হাঁড়ির
অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে....
কোন একটা লম্ফ ছাড়াই
রঙ্গ করে আমার মুখে
ঢুকিয়ে দিলেন পানের খিলি।

সোমালিয়া

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

ব্যাধ নিয়ে আলোচনা করতে করতেই
কোন সময় বৃষ্টি নামবে।
চারফুট ছয়ফুট ছক্কা উল্টে, সেইদিন
বাগান বানাবে এক
দলছুট পয়গম্বর।

আপাতত তারামণ্ডলের মত পেটে
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিড়
আপাতত স্টিফেন হকিং
সংকোচন বা প্রসারণ

পরম উল্টো জিভ, রেখেঢেকে কৃষ্ণগহ্বর

দীর্ঘকালীন কোনো ঘানার ভৃত্যের মতো চোখে
আপাতত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল।

সন্ত্রাস

কল্যাণ মিত্র

মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে
গাছের জায়গায়।

সভা চলছে
নাগরিক সমিতির সান্ধ্য সাধারণ সভা
শব্দ হচ্ছে,
অন্ধকার চমকে উঠছে আলো

মাঝে মাঝে খবর আসছে
আর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে সবাই
এক মিনিট নীরবতা।

মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে
গাছের জায়গায়
মাছগুলো ভেসে যাচ্ছে
মিষ্টি জল থেকে নোনা জলের দিকে।

ভয়

সুব্রত সিনহা

রোগা মেয়েটা ছাদে একা কাঁদে
শূন্যতার ধু-ধু পাতা, তুমি ওকে সঙ্গ দাও

চিবুকে দাঁতের দাগ ব'সে আছে
উপবাসীকে রুটি দাও, জল দাও

জানলার পাশে কার ছায়া ?
শুধুই গন্ধ, মায়াবী আঁচলের !

বৃষ্টি, তুমি কি মেয়েটার বন্ধু হবে ?
ওকে বলো এখান থেকে চলে যেতে—
এ-তল্লাট এখন শাদা মরুভূমি।

ভবতারণ

অরণি বসু

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি ভবতারণকেই খুঁজি।
বারান্দা থেকে কোমর ঝুঁলিয়ে
যতদূর সম্ভব নরম স্বরে ডাকি, ভবতারণ! ভবতারণ!

সামান্য কয়েক ফোঁটা সবুজ তারপর
একেবারে হৃদয় পর্যন্ত ধু ধু ধূসরতা।
ওই সবুজের মধ্যে সন্তর্পণে ভবতারণকে খুঁজে বেড়াই।
কতক্ষণই বা!
যতক্ষণ না সকাল আমাদের গড়িয়ে দেয় রাস্তায়—
রাস্তায় অন্নদাস হয়ে ঘুরি হিংসে আর লোভের পেটের ভিতর,
ঘুরি হট্টগোলে, দৌড়, নির্লজ্জতা আর আগুন ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
হাসি, হাসাই—
চমকে যেতে যেতে কাউকে কাউকে আবার
চমকেও দিই কখনো সখনো।
ভবতারণ সেখানে থাকে না।

অবসন্ন, ক্লান্ত বাড়ি ফিরি ভবতারণকে খুঁজতে খুঁজতে।
ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে দি আর্তস্বর, ভবতারণ! ভবতারণ!

তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

ঢেউ

অর্ণব সাহা

ঢেউ, কেশ ছোঁয়াতেই গলিত রঙের মত বিপদের ঢেউ
নেমেছে সরণীপথে, তোমার কলম্বাস খুলে নেয় রূপোলী তবক—
স্বরবর্ণেই মেশে, প্লুত অক্ষরদল ঘুমের তরণীপারে ঐ
স্বপ্নসমেত নেয় তোমাকে, সওয়ারী তুমি, কানাকড়ি নেই, তবু ওঠো

আমার ডিঙিতে, ছই, পূর্ণ মুখটি তোলো পরম আড়াল।
বনপ্রভুদের শ্যেণ দৃষ্টি পেরোই চলো, অদূরেই ধোঁয়া কাজিরাঙা
ওলাবিবিটির থান অনেক পিছনে, দেখ, গরাণকাঠের ডিঙা, ছই
এবার নামিয়ে দিই, হাওয়াও রয়েছে বেশ, এই জল সোঁদা লবণের।

অচল মোহনা দেবী, শমিত পয়ারমুখ আর কতো দূরে গেলে পাব?
কোহলে ডোবানো চোখ, আমাদের ধাওয়া করে মেরুশেয়ালেরা—
তিন সাম্পান খুব ঝাপসা দেখেছি সোনা, ভয় পাই, তুমি বনচর
দেশের লাজুক মেয়ে, অথচ রুক্ষ, তাই কীভাবে সামাল দিতে পারি

এই শয়তান ঢেউ, পশুদেবতার লালা....দেখেছ রাবেয়া ওরা আসে
বরফের ম্যাপবই, পলির অতলে জমা উপসাগরের তলা দিয়ে
কেমন বিপদজল বিষের আঙুলগুলি ছুঁয়ে যায় অসহায় গ্লোব,
যা হিম পাত্র ভরা টলটলে সুরা, আমি বলেছি লাজুক মেয়ে, দেখ—

ফেনায় রক্ত ভিজে মোহনার উপকূল, লুটোনো নাবিক ডিঙি, ছই
ঢেউ, খোলা পীত কেশ, ছোঁয়াতেই নোনারঙ বিপদের ঢেউ....

গার্হস্থ্য পাঁচালী

শ্যামলকান্তি মজুমদার

কষ্টে মাখা ভাত মেখে কষ্টে খাই কষ্টের থালায়
কেউ ডাকে গাঢ় স্বরে কেউ ডাকে হাত ইশারায়
রোদে হাঁটি বৃষ্টি ভিজে ফিরে আসি ঘরে
ছেঁড়া কাঁথাখানি গায়ে শীতে কাঁপি দেবতার বরে
ফি বছর স্বপ্নে দেখি স্বচ্ছল সংসার
চতুর্দোলা উল্টে ভাসে, ফুটো ডিঙা সমুদ্রে যাবার।

অ্যালবাট্রসের ডানা

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

আবার স্বপ্নে ভেসে ওঠে মৃত নাবিকের চোখ

অ্যালবাট্রসের ডানা, সৈকতে ছড়ানো পালক
ঢেকে দিল নোনা দ্বীপ, দুপাশে দীর্ঘ গিরিখাদ
কলাবাগানের পাশে পোপের টুপির মত চাঁদ
ড্রাগনের নিশ্বাসে ভেঙে পড়ে বাতিঘর, দূরে
ক্রীতদাস বন্দর, হারানো জাহাজ ঘুরে ঘুরে
নোঙর ফেলেছে শেষরাতে, মেঘ ঝুলে আছে আর
ধীবরের জালে ধরা পড়ে এক সবুজ গীটার
কেউ কি তখনো জেগে ? তরল ধাতুর মত ঘুম
স্ফীত তলপেট, শাদা অ্যাপ্রন, ডিমের কুসুম
শুষে নেয় আর্দ্রতা, বুদ্বুদ, চূর্ণ হাওয়ায়
গভীর অরণ্য থেকে ড্রামের শব্দ শোনা যায়
ঢেউ আরো ঢেউ, ফেনা, মৎস্যনারীর খোলা চুল...

রাতের জরায়ুপথে ফুটে ওঠে সূর্যমুখী ফুল

'কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায়' : জয় গোস্বামীর বাঁক বদল

প্রবুদ্ধ বাগচী

স্মৃতির ভেতর থেকে যেটুকু তুলে আনতে পারছি, প্রায় বছর পাঁচেক আগে পুরোনো 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় হঠাৎই চোখে পড়ে "সৎকার-গাথা" নামক একটি কবিতা—কবিতার নিচে যে নামটা ছাপা হয়েছিল, তা হলো সন্ধ্যা ভৌমিক। এক ধাক্কাতেই কবিতাটা আমাকে বেশ খানিকটা বিমূঢ় করে দেয়, এই স্মৃতিটা এখনো বেশ জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই এ কবির অন্যান্য কবিতার সন্ধানে নিজেকে ব্যস্ত রাখি এখানে ওখানে। সেই সূত্রেই হঠাৎ করে জেনে ফেলি, আসলে ঐ কবিতার প্রকৃত কবির নাম, জয় গোস্বামী। জানিনা, কেন ঐ ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছিল ও-কবিতায়। তবে আমার সংগে জয় গোস্বামীর পরিচয়ের প্রারম্ভিক সেতু ঐ "সৎকার-গাথা" কবিতা।

এই সূত্রপাতই ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে নানাভাবে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জয় গোস্বামীর কবিতা পড়ে ফেলি বুভুক্ষুর মতো : এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতেই চোখে পড়ে যায়, 'শীর্ষাসন', 'বরষাবন্দনা' এমনকি 'স্নান'-এর মতো অমোঘ ভালোবাসা, ভালোলাগার কবিতা। আসলে, এমনতো হয় কখনো কখনো, অকস্মাৎ কোনো কবিতার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার সম্মোহনের ছায়ায় নিজেকে সমর্পণ করে মনে হয়, এ তো আমারও ভিতরের কথা, এই ভাবনাই তো আমি বহন করছি দীর্ঘকাল ধরে—এই বিশেষ কবিতাই যেন খুলে দিল সেই গোপন অব্যক্ত অনুভূতির অর্গল, আর এভাবেই যেন গড়ে উঠল এক নিবিড় বাঁধন—কবি ও কবিতার সংগে। বলা বাহুল্য, জয় গোস্বামীর কবিতার সংস্পর্শে আমার ভিতর ঝলসে উঠেছিল এমনই প্রতিক্রিয়া। আর সংকোচের সংগে হলেও বলতে বাধা নেই যে, কিছু কবিতা পড়ার পরবর্তী অভিঘাতে আমি নিজেও লিখে ফেলেছিলাম বেশ কয়েকটি কবিতা। হতে পারে, সে সব অসম সৃষ্টির অবচেতনে হয়তো মিশ খেয়েছিল জয় গোস্বামীর কবিতার ধরন-ধারণ। থাক্, এসব ব্যক্তিগত বাচালতা।

আরো একটা জরুরী বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হবে। ঠিক যে সময়ে জয় গোস্বামীর কবিতার সংগে পরিচয় ঘটেছিল আমার, সেই সময়ে একটা দোদুল্যমানতার ভিতর বহমান ছিলাম আমি এবং হয়তো আমারই মতো আরো

অনেকে। এই অস্বস্তিটা ছিলো কবিতার গ্রহণযোগ্যতাকে ঘিরে। কখনো মনে হতো সোচ্চার রাজনৈতিক উচ্চারণই বুঝি কবিতার একমাত্র আশ্রয়, আবার কখনো সমাহিত গভীর অনুভবের কোনো কবিতা এমনভাবে জড়িয়ে ধরতো চেতনার ডালপালা, যে তখন অথৈ সন্দেহ জেগে উঠতো প্রাক্তন ধারণার ওপর। ব্যক্তিগত জীবনের বৃত্তে যখন এমন ক্রান্তিকাল, তখনই জয় গোস্বামীর কবিতা চিনতে শেখালো এইরকম বিধিবদ্ধ চিন্তার ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে। যেন অনেকটা ছকভাঙ্গা চেতনার হাওয়া উথাল-পাথাল করে দিল আমার ভিতরের স্রোতহীন চিন্তার আধারকে। এখানে আমি তাঁর কাছে ঋণী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানান লেখার ভেতর দিয়ে কবি হিসেবে যে জয় গোস্বামীর সংগে আমার পরিচয় ঘটেছে ইতিপূর্বে, সেই পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক কবিতা-ভাবনার ভেতর দিয়ে জয় গোস্বামীকে অন্বেষণ করার ব্যাপকতর প্রয়োজনেই এই রচনার সূত্রপাত। এই বিস্তৃত প্রয়াসে একটা অঘোষিত সমস্যা সর্বদাই অন্তর্নিহিত থেকে যায়। বিড়ম্বনাটা আসলে কোনো কবিতাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, কবিকে বিশ্লেষণের আলোয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-বিশেষের বিচারবোধ অপর কারোর কাছে পরিত্যাজ্য হতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ডেকে আনতে পারে মতের বৈরিতা। সর্বোপরি, জীবনানন্দ দাশের "সমারূঢ়" কবিতাটি এ সমস্ত আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই আমার চিন্তার পথ জুড়ে দাঁড়ায়, আমাকে বিপর্যস্ত করে। তবু শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা, কোনো সার্থক কবিতার ভেতর থেকে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছুরিত হয় সাতরঙা বর্ণালীর আভা, সুতরাং বিশেষ কোনো বিচারবোধের পাশে অন্য ধাঁচের মতামত আসলে তৈরি করে একটা পরিপূরক মাত্রা, যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত। স্বভাবত এ মূল্যায়ন যদি তন্নিষ্ঠ কোনো অপর রসগ্রাহী পাঠককে ভিন্ন অনুভবের দিকে প্রাণিত করে, তবে তা আমার প্রয়াসকে হয়তো অন্যভাবে সার্থকতার শিরোপা দিতে পারে।

সত্তর দশকের প্রথমার্ধ থেকে কবিতার জগতে এসেছেন জয় গোস্বামী। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্য-ভাবনার পরিচয় বহন করছে "কবিতা সমগ্র" বইখানি। এই বই অনুযায়ী প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ"-র প্রকাশকাল ১৯৭৭ সাল, ধরা যেতে পারে এরও আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল তাঁর কাব্য সাধনার—এই

বিচারে, যখন বাংলা কবিতার জগতে নিজেকে মেলে ধরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন জয় গোস্বামী, তখন বাংলা কবিতা একটা বড়ো পটবদলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগ থেকে এ-পর্যন্ত বাংলা কবিতা অনেকগুলো ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এসেছে। ঐ বিশেষ সময় আমার ধারণায় একটা পালা-বদলের সন্ধিক্ষণ।

কেননা, ত্রিশ দশকের জীবনানন্দ দাশের একেবারে ভিন্নধর্মী কবিতা-চেতনার পরবর্তী ধাপে চল্লিশের কবিতা প্রত্যক্ষভাবে হাজির করেছিল রাজনৈতিক-সামাজিক স্বপ্নময়তা। সমসাময়িক পৃথিবীর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর কৃষ্ণপ্লাবী গণআন্দোলন একেবারে খোল-নলচে বদলে দিয়েছিল কবিতার, যে দিক বদলের কাণ্ডারী ছিলেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা রাম বসু, দিনেশ দাস প্রমুখেরা। চল্লিশের সামাজিক দায়বদ্ধতার তীব্র অভিঘাতের থেকে সরে থাকা সম্ভব হয়নি কোন কবিরই পক্ষে—এমনকি, জীবনানন্দ দাশ বা অরুণ মিত্র তখন কথা বলেছেন অন্য স্বরে।

পঞ্চাশের চৌকাঠে এসে আবার বাংলা-কবিতা সরে এলো অন্য চেহারায়। অভিযোগ উঠলো চল্লিশের কবিতার বৈচিত্র্যবিহীনতা, মুখর রাজনৈতিক ভাষণকে ঘিরে। তারপর 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর নেতৃত্বে কবিতা আবার ফিরে এল ব্যক্তিগত অনুভবের বৃত্তে। এই ভাবনার সংগে মিললো ইন্দ্রিয়নির্ভরতা, স্বেচ্ছাচারী দায়হীন একধরনের জীবনদর্শন—সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মুক্তি পেল কবিতা। কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজে পেলাম চমকপ্রদ আবিষ্কার ও উন্মোচন।

পঞ্চাশের কবিতার এই মূল স্রোত বহমান ছিলো ষাট দশকের শেষার্ধ, যতদিন না পর্যন্ত অন্য এক রাজনৈতিক ধাক্কা বদলে দিল কবিতার চেহারাকে। এই ভিন্নধর্মের বামপন্থী আন্দোলনের উজ্জীবন বেশ খানিকটা আচ্ছন্ন করেছিল বাংলা কবিতাকে সন্দেহ নেই। সেই স্রোত ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসে, বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ মুছে যায় সময়ের টানে। আর এইখান থেকেই আরম্ভ হয় এক নবজন্মের।

বিগত দশকের দুই বিপ্রতীপ ধারার সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে তৈরি হলো এক তৃতীয় চেতনা, সত্তরের প্রথম থেকেই যার গোড়াপত্তন হতে থাকে। একেবারে নির্দিষ্টভাবে শ্লোগানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘোষণা যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, আবার নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির সংকীর্ণ গণ্ডী এবং সমাজ-নিরপেক্ষ অতি-সরলীকৃত মানবিকতার মধ্যেই যে কবিতার একমাত্র অধিষ্ঠান হতে পারে না, এই দুই

সত্যকে আত্মস্থ করেই চলা শুরু করেছিলেন এই সময়ের কবিরা। স্বাভাবিকভাবেই এই পর্বের কবিতায় অনুপস্থিত উচ্চকিত রাজনীতির কথা, কিন্তু সামাজিক নানান বিষয় সূক্ষ্মভাবে কবিতায় হাজির। আবার নিছক ইন্দ্রিয়নির্ভরতাকে টপকিয়ে কবিরা চোখ মেলেছেন নতুনভাবে, সংগে মিশেছে আরো নানান সাময়িক অনুষঙ্গ। এইভাবে এক দ্রবীভূত সংবেদনশীলতার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছেন একেকজন, যার যার নিজস্বতায়। আমার মনে হয়, পঞ্চাশের যুগে শঙ্খ ঘোষ বা সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ কারোর কারোর মধ্যে যে ধারাটি অল্পে অল্পে বিকশিত হতে শুরু করেছিল, তারই সুনির্দিষ্ট পরিণতি ঘটে এই সত্তর দশকের শুরু থেকে। জয় গোস্বামী শুরু করেছিলেন এই নবলব্ধ ধারার ভেতর। হয়তো এই বক্তব্যের খানিক সমর্থন মিলতে পারে জয় গোস্বামীর নিজেরই কিছু স্বীকারোক্তি স্মরণ করে নিলে, যেখানে তিনি অকপটে জানিয়েছেন তাঁর নিজের কবি-জীবনে শঙ্খ ঘোষের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা। তাহলে কি ব্যক্তিগত চেতনা-স্পন্দনের সংগে শঙ্খ ঘোষের কাব্য-ভাবনার নিবিড়তম সখ্যতাই তাঁকে পৌঁছে দিল এমন উপলব্ধির সীমানায়? আমার মনে হয়, এমন যুক্তিক্রম অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কাছে।

জয় গোস্বামীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছে" প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র আটটি কবিতা নিয়ে। এই পর্বের কবিতা বেশ কিছুটা অন্তর্মুখী, কবি যেন আপন খেয়ালে বলে যাচ্ছেন পরপর কথাগুলো এবং এইভাবে একটা আপাতপারম্পর্যহীনতায় ডুবে আছে কিছু কিছু ভাবনাকেন্দ্র। যেমন,

....তুমি সব জেনেও রোমাঞ্চ
বিস্মৃতি, সমানুপাত টাঙিয়ে আড়াল করলে চতুর হত্যাকে!
তরুণ পুরোনো মুখ দেখ আজ ছেয়ে গেছে প্রাচীন ছত্রাকে....

(শ্মশ্রুময়ঃ ক্রীসমাস ও....)

তবে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো থেকেই যে আশ্চর্য একটা ভঙ্গি তৈরি করে নিলেন জয় গোস্বামী, তা হলো কবিতার বর্ণনায় সিনেমার পরপর সাজানো শটের মতো দৃশ্যরূপ এবং কবিতার মধ্যে অকস্মাৎ কোনো আটপৌরে সংলাপ ব্যবহার যা কবিতাটাকে হঠাৎ ফিরিয়ে দেয় অন্তর্নিহিত চেতনার দিকে, হঠাৎ একটা ধাক্কায় সচকিত হয়ে ওঠেন যেন কবিতার পাঠক—এমন সংলাপের বাঁধুনি কবিতাকে যেন একটা মেরুদন্ডে দৃঢ় সংস্থাপিত করে দেয়। সিনেমা-শটের মতো ঠাস বুনট লক্ষ্য করা যেতে পারে "ক্রোরপক্ষী" কবিতায়—

উড়ন্ত মুহূর্ত থেকে নেমে এসে দেবতা যে-হ্রদে
বিশ্রামে বসেছিলেন, সেই জলে হঠাৎ ছোঁ মেরে
দেবতার চক্ষু দু-টি তুলে নিয়ে লালার পারদে
গভীর আদর করে রেখে দিল ক্রোরপক্ষী, রোদে
অথবা,

যেই অক্ষিরস সন্তর্পণে ওর
পিচ্ছিল গলার মধ্যে নেমে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ওম
প্রবেশ করালো কোষে তখনই চিমনির দন্ড, চাকা
সরে গেল পরপর, হর্ম্যসারি, শূন্যে জেগে ওঠা
স্বর্গের জানালাগুলি দেখা গেল, টানা করিডোর....

আটপৌরে সংলাপ ব্যবহারের বলিষ্ঠতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই বই-এর "জন্মপত্র" কবিতাটি। ধরা যেতে পারে এই পংক্তি ক'টিকে—

অথচ সেদিন রাত্রে যখন আরক্ত ঘন মদে
ভরে দিলে ওর মুখ একা একা সবার অমতে,
আর ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে নিল সিঁদুর, শৃংখল
তখনই করুণ টিপ কেঁপে গেছে আশংকায় আরো ঃ
'কী ভালো তিনতলার ফ্লাট, তাও খুব একা লাগে, আর ও
এত দেরী করে রোজ!'

সামান্য একটা সংলাপের ব্যবহার কতো সাবলীলভাবে চিনিয়ে দিলো কবিতার মেজাজ!

সমস্ত কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটা সুঠাম ছন্দ যা এইসব কবিতার অন্যতম সম্পদ বলে চিহ্নিত হতে পারে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে কবিতার ঘনবদ্ধ চিন্তা-সংহতি এই পর্বের কবিতাগুলোর সংগে পাঠকের একটা সূক্ষ্ম আড়াল নির্মাণ করে দিয়েছে বলে আমার মনে হয়।

যে অন্তর্মুখী ঝোঁক চিহ্নিত হয়েছিল "ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছে"-র কবিতায়, সেই প্রবণতা টপকে আমরা দেখতে পাই কবির এক নতুন অবস্থান "প্রত্নজীব" কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। এখানে অন্তঃপ্রবাহী চেতনা ধীরে ধীরে

চিহ্নিত হতে পারে। এই কবিতায় দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিবিষ্ট বর্ণনা, যেমন,....ধু ধু সাদা স্ক্রীনের মসৃণে / দুলে উঠলো তিনশো নব্বই কোটি বছর আগের / পৃথিবী, তরল ধাতু, ফুটন্ত লোহের / কালো ধোঁয়া, বুদ্বুদ উপছে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, ঢেউ / গাঢ় তরলের, আর হঠাৎ কোথাও / ফুঁসে উঠছে আগ্নেয় ফোয়ারা, বিস্ফোরণ....

(ভ্রূণ ঃ প্রব্রজীব)

অন্যদিকে নিজের জীবনের কথা বলার চেষ্টা একেবারে সাময়িকতার আধারে—

আর সেই চুয়ান্নর নভেম্বরে কোনো
হাসপাতালের বড় বারান্দায় একটি নতুন বাবা মা-র
আশঙ্কা, উদ্বেগ, হর্ষ আজ এতদিন পর সে হাসপাতাল থেকে সরে
এই এতদূর প্রায় পাড়াগাঁয়ে এসে
একটি জানলার পাশে সারারাত বাঁশপাতা দোলালো....

(ভ্রূণ ঃ প্রব্রজীব)

বাংলা কবিতায় এ ধরনের অনুভূতির বিস্তার যা জয় গোস্বামীর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অস্বীকার করবো না, আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর আনকোরা বসন্তবাতাস। যদি অন্য কেউ, এই মহাজাগতিক প্রক্রিয়াকে নিজের মধ্যে বহন করার প্রয়াসকে মৃদু তুলনা করতে চান আরেক প্রবীণ কবি রাম বসুর "ভাবনা" কবিতাবলীর সঙ্গে তবু সে বিচার যথার্থ বলে গ্রহণ করতে পারবো না, কেননা দুই কবির ভাবনা-কেন্দ্র স্পষ্টত পৃথক। দুজনে এইভাবে অনন্যতার বাহক।

"প্রব্রজীব" "ভ্রূণ" কবিতার আঙ্গিক ঘিরেও কিছু কথা বলা জরুরী। এর আগে সুবিন্যস্ত শটের মধ্যে দিয়ে এ কবিকে তুলে ধরতে দেখেছি কবিতার চেহারা আর এখানে দেখছি, দ্বন্দ্বদৃশ্য তৈরির অনবদ্য দক্ষতা। প্রাচীন সময়ের কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ ছিটকে আসা একেবারে বর্তমানের কিনারায়—এই ভঙ্গিমা আমাকে বিমোহিত করেছে। সহজেই তুলে আনতে পারি, এই পংক্তি ক'টি—

তারপর পর্বতমালা মাথা তুলছে জলের ভিতর / থেকে, হু হু করে জল ঢুকে পড়ছে পাশের ডাঙায়.... / কালো সুড়ঙ্গের মতো গুহার ভেতর থেকে / এরপর বেরিয়ে এলো দু-পায়ে ভর করে / সামনে একটু ঝুঁকে পড়া রোমশ প্রাণীটি, /

ছোটো গর্তে বসা চোখ, থ্যাবড়া চোয়াল, / ঘন কালো রোমাবৃত স্তন, আর হাতে / ঝোলানো হরিণ একটি / তার কাঁচা মাংস চামড়া হাড় / নখ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে একবার মাথা তুললো সে, / সারা মুখে গাঢ় রক্ত....স্টীল ফ্রেম চশমা আর কাঁধের উপরে খাটো চুল / আনমনা কফির কাপ থেকে ঠোঁট তুলে / জানলার বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি, একটু খোলা ঠোঁট....

(ভ্রূণ ঃ প্রব্রজীব)

যদি দাবি করি এমনতর বর্ণনা বাংলা কবিতায় এক নবদিগন্ত!

"প্রব্রজীব"-এর পর "আলেয়া হ্রদ"। যে অন্তর্মুখী ধারার প্রস্ফুটন ঘটেছিল "প্রব্রজীব"-এ, তারই সম্প্রসারণ দেখা যাচ্ছে। কবিতার ভাষা যেন আরো খানিকটা সহজ হয়ে এল, সেই সঙ্গে দেখা গেল ঝরঝরে ছন্দের মিল, যা চিনিয়ে দেয় জয় গোস্বামীর আরো একটা বৈশিষ্ট্যকে। যেমন "রোমাঞ্চকাহিনী" কবিতার চমৎকার এ দুটি লাইন ঃ

'জানো পড়াতে পারিনা ইতিহাস, তবু এই প্রচণ্ড গরমে / তুমি খুলে দিলে চোরাকুঠুরি, যাতে পিষে যাই ভারী খড়মে।'

"আলেয়া হ্রদ"-এর প্রথম পর্বের কবিতায় আরেকটা জিনিষ খুব স্বাভাবিকভাবে চোখে আসে, তা হলো কবিতার মধ্যে উঠে আসা কিছু চরিত্রের বর্ণনা। যে কবি নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন যে তাঁর চারপাশের প্রতিটি মানুষ, প্রকৃতি সব কিছু তাঁর কবিতার অন্তর্গত হয়ে আছে, তার কাছে এমন প্রত্যাশা কিছু নতুন নয়। কিন্তু বিশিষ্টতা এখানে যে, জয় গোস্বামীর বাসভূমি কলকাতা কেন্দ্রিকতার বাইরের একটা স্বল্পখ্যাত মফঃস্বল শহরে। সেই বাসস্থানের সূত্রে নানান চরিত্রের সংগে তাঁর নিয়ত ওঠাবসা। মফঃস্বল শহরের এইসব চরিত্রগুলোর মধ্যে মিশে থাকে এক ধরনের আলাদা মেজাজ, মেট্রোপলিট্যান পরিবেশে থেকে তাদের নাগাল পাওয়া বেশ দুষ্কর। এই সব টাইপ চরিত্রকে একেবারে মফঃস্বলের জলহাওয়ার সংগে খাপ খাইয়ে কবিতায় ধরে আনা এক দুঃসাহসিক ব্রত—আর এই ব্রতপালনে সিদ্ধ কবি জয় গোস্বামী। "জন্তু" কবিতায় 'অনুবাবু' নামক কোনো চরিত্রের বর্ণনা দেখা যাক,

'....হঠাৎ খুপরিতে / পায়রা ঝটপট করল, খুব নিচু ভলুমে রেডিও, মাথা ময়দা স্তূপ করে / রেখেছো একপাশে, অনুবাবু, সারা মুখে ঘাম!'

কি আশ্চর্য অনুপুঙ্খ বর্ণনা! অথবা "ট্রাক" কবিতায় 'বনানীমাসীমা'র কথা। আসলে, বাংলা কবিতায় প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা এমনভাবে বেড়ে উঠেছেন কলকাতা ঘিরে যে কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত গ্রাম বিংবা মফঃস্বল বাংলার কাহিনী—জয় গোস্বামীর এই বৈশিষ্ট্য তাই আমার কাছে একটা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলে ধরা পড়ে। স্পষ্ট অর্থেই যার সূত্রপাত "আলেয়া হ্রদ"-এ।

"প্রব্রজীব"-এর "ভ্রূণ" কবিতায় জয় গোস্বামী তৈরি করেছিলেন যে নতুন অনুভূতির স্তর, "আলেয়া হ্রদ"-এর মধ্য পর্বের কবিতায় আবার ফিরে এল সেই পুরোনো ভাবনা। আবার আমরা সামনে পাচ্ছি বিশ্বজগতের রহস্যঘন উত্থান-পতনকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার দৃশ্যপুঞ্জ। এই পর্বের 'বীজ', 'শক্তি', 'জলাধার', 'বাষ্পমেঘ' বা 'ঘনদেশ' ইত্যাদি কবিতায় আমরা শুনতে পাচ্ছি :

'ধীরে ধীরে ডুবন্ত পাথর, আরো ধীরে / তলানো শরীর / দিগন্তে উপচে ওঠে নীল ফেনারাশি, তার চাপ ভেদ করে / যে উঠে আসছে সে কি বরফ-মোড়ানো ধূমকেতু?'

(বাষ্পমেঘ : আলেয়া হ্রদ)

অথবা,

'আমি ফিনকি দিয়ে তার থেকে উপচে পড়েছি / সমস্ত ঋতুর দিকে—তারা আজ আমার দেহকে / বাতাসে পেষাই করছে ; ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া, / পশুদের হলকা তুমি জেনলে আনো—লতার নিঃশ্বাসে ধরো তুলে / দ্যাখো আমি মিশে যাই দ্রবণে তরল পরমাণু....'

(ঘনদেশ : আলেয়া হ্রদ)

কোনো সার্থক স্রষ্টার অবধারিত ইঙ্গিত ধরা পড়ে নিয়ত পরিবর্তমান বস্তুবিশ্বের সঙ্গে তার রূপান্তরের মাপকাঠিতে। জয় গোস্বামী অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নন। ইতিপূর্বেই তাঁর কাব্যচেতনার বিবিধ রংবদল খুঁজে দেখার চেষ্টা চালিয়েছি এই আলোচনায়। "আলেয়া হ্রদ"-এর শেষ পর্বের কবিতায় আরো একবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এক বিশেষ পর্বান্তর। এখানে মৃত্যু-চেতনা কবিকে ধাক্কা দিচ্ছে বারবার, যা সূচিত করছে ভিন্ন এক জয় গোস্বামীকে। নিজের জীবনের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ অস্তিত্বের সংযোগ ঘটাতে চাইছিলেন যিনি বারবার, হঠাৎ তিনি সরে এলেন মৃত্যুউপত্যকার কিনারায়। এখানে রাত্রির অনুষঙ্গে মৃত্যু

প্রতিক্ষণে উঁকি মারছে কবিতার আকাশে-বাতাসে। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে যদি দেখি, দেখতে পাবো, এই পর্বের চব্বিশটি কবিতার মধ্যে উনিশটি কবিতায় প্রত্যক্ষ-ভাবে হাজির 'রাত্রি'র উল্লেখ অথবা 'মরা চন্দ্রালোক'-জাতীয় বর্ণনা। এবং দৃষ্টান্ত বিছিয়ে দিয়ে একথা বোঝা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই রাত্রির সংকেত আসলে তুলে আনছে মৃত্যুরই দ্যোতনা। যেমন, "গৃধিনী" কবিতায়—

'রাত্রি ভরে গেছে জলে, ডুবোপাথরের গায়ে ঘষা লেগে লেগে / তুমি আজ ভেসে উঠলে ধাক্কায় চুমার মুখ নিয়ে'

এর ঠিক পরেই পাচ্ছি মৃত্যু-বিষয়ক দুটি কবিতা "দ্বীপ সোনাচূড়ো" এবং "প্রেমিকা মাটির"। তারও পরের কবিতাগুলিতে ভেসে আসা মৃত্যু-চেতনা আমরা গুছিয়ে নিতে পারি এইভাবে—

১. আমার বিছানা কেউ পেতে রেখে গিয়েছে বালিতে। / বাতাসে গরম ছাই উড়ে এসে আমার পাতায় / লেগে যায় প্রতিরাত্রে

(হাড় : আলেয়া হ্রদ)

২. শিলাপৃথিবীর মধ্যে এখনো রয়েছে মুখ গুঁজে / পিছনে সমুদ্র ডাকছে। খোঁচা খোঁচা ঝকঝকে পাথরে / রাত্রি এসে গিঁথে যায়।

(নিষেধ : আলেয়া হ্রদ)

৩. রাত্রির ভিতরে শুধু আতঙ্কে কঁকিয়ে ওঠে কয়েকটি শৃগাল.... / আমি ফিরব না আর, যারা যারা কাঁধে করে এনেছে এ শব / তাদের একজনও যেন না-খেয়ে ফেরে না!

(ঘাস : আলেয়া হ্রদ)

৪. নির্জন জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, সারারাত্রি ক্ষরণ, ক্ষরণ....

(বন্ধুকে রাত্রির চিঠি : আলেয়া হ্রদ)

৫. যদি কোনদিন তার মনে পড়ে তবে বাতাসের মধ্যে ভেলা / ক্রমশ এগিয়ে আসছে দেখতে পাবো সুদূরে আকাশযান থেকে। / দুখানি ফুসফুসে আমি আগুন ধরিয়ে রাত্রিবেলা / দোলাবো আকাশপথে বর্শাফলকের মধ্যে গেঁথে।

(রক্তমেঘ : আলেয়া হ্রদ)

বুঝতে অসুবিধে হয়না মৃত্যুঞ্জয় অনুভব কেমনভাবে চারিয়ে দিয়েছে তার শিকড়-বাকড় জয় গোস্বামীর ভিতর।

কিন্তু কেন এই ভিন্ন রকমের অনুভব? কেনই বা মৃত্যু-আচ্ছন্ন কবি উচ্চারণ করছেন আত্মধ্বংসের কথা? সম্ভবত এইসব সঙ্গত কৌতূহলের জবাব আমরা খুঁজে পাবো "উন্মাদের পাঠক্রম" কাব্যগ্রন্থের কবিতার ভেতর। জয় গোস্বামীর বহু-আলোচিত এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে খুব নির্দিষ্টভাবে ধরা পড়ছে দুটি স্রোতের উপস্থিতি। প্রথমত জয় গোস্বামীর ব্যক্তিগত জীবনের মাতৃশোক এবং সে-সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া নির্মাণ করছে এই বই-এর কিছু কবিতার প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয়ত কবির নিজস্ব দৈহিক যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬ সালে এবং কবিতা সমূহের রচনাকাল ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৫'র ভেতর। খুব নির্দিষ্টভাবে দাবি করতে পারছি না, তবে আমার ধারণা এই পর্বে হয়তো জয় গোস্বামী শারীরিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত ছিলেন খুবই, সেই সঙ্গে মাতৃবিয়োগের ধাক্কা বিপর্যস্ত করেছিল তার মানসিক সাম্য এবং কখনো কখনো এই দুই পারিপার্শ্বক প্রতিক্রিয়াকে আঁকড়েও গড়ে উঠেছে কবিতার শরীর।

বিহ্বল প্রিয়াবিচ্ছেদের শোক বহন করছে বইটির সূচনা পর্বের কবিতাটি। এছাড়া নিতে পারি "বিবৃতি" কবিতাটিকে যেখানে শোকসংহত উচ্চারণ ঃ

'চল দেখি কার ঝলসানো ভিটেমাটি/কার ভাঙা গ্রাম শুয়েছে জলের কাছে/ বুড়ি দিদিমণি পোড়া দিদিমণি কার/আগুনের নীচে এখনো ঘুমিয়ে আছে!'

আর মেরুদণ্ডে সাড়াতোলা "সৎকার গাথা" তো রয়েইছে। যেখানে একাকার হয়ে আছে শোক আর ক্রোধ, ভালোবাসা আর ঘৃণা, নগ্নজ সন্তাপের পাশে দৃপ্ত প্রতিবাদ। আমার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসে তো বটেই, এমনকি বাংলা কবিতার ইতিহাসেও এ-কবিতাকে কেউ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্বচ্ছন্দে দাবি করতে পারে।

দৈহিক যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ভেতর দিয়ে চেনা যাচ্ছে যে কবিতাগুলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "রাত্রি ১৮ই জুন", "আরোগ্য নার্সিংহোম", "চিৎসাঁতার", "প্রলাপ", "বাগিচা" ইত্যাদি কবিতা।

তবে এই সমস্ত কবিতার প্রকাশভঙ্গিমার ধারাবাহিকতায় অন্তর্গত হয়ে আছে

অন্য একটা সূক্ষ্ম বিবর্তনের আদল। নিজের শারীরিক যন্ত্রণার তীব্রতা সরাসরি এসে পড়ে "আরোগ্য নার্সিংহোম" কবিতায় ঃ

'গঙ্গাজল, গঙ্গাজল, ঘোলা গঙ্গাজল / ছুঁচোপাইপ, ছুঁচোপাইপ, রক্ত বেরোচ্ছে / সহ্য করো, পারছি না আর, সহ্য সহ্য, অস্ত্রচিকিৎসক / মূত্রজল, মূত্রজল, আঃ মূত্রজল আমি দম নিতে পারছি না'।

আর এই বিড়ম্বিত অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য তীক্ষ্ণ আকুতি ছড়িয়ে পড়ে দেখি "রাত্রি, ১৮ জুন" কবিতায়, যেখানে তিনি বলেন ঃ 'দ্যাখো, এও এক অস্থিসার অভুক্ত ব্রাহ্মণ তবু সুজাতা-অন্নের অধিকার / যে কখনো পাবে না জীবনে শাস্তা তুমি জেতবনে আমাকে আশ্রয় / আজকে রাত্রির মতো দাও আমি আজীবন কৃতজ্ঞ তোমার কাছে আমি'।

অথচ এই বেঁচে ওঠার প্রার্থনা হঠাৎ যেন সরে গেল পরিত্রাণহীন আত্মসমর্পণে। মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন শুধু নয়, তার পাশাপাশি চেতনার দর্পণে ভেসে উঠছে আগামী জন্মের ছবি এবং নিশ্চিতভাবে শুনতে পাচ্ছি বর্তমান পরাভূত জীবনের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ধিক্কার—যেমন "চিৎসাঁতার" কবিতায় এর প্রকাশ ঃ 'দিক দিক বৃষ্টিজল ধুয়ে দিক মাঠঘাট নগর ভাসানো বন্য জল / টেনে নিয়ে দূরতম নদীতে ফেলুক, কিন্তু যখন আসবো পরের বার / আমি কবিখ্যাতি চাই না, প্রীতি ও শুভেচ্ছা চাই না, না সমুদ্র চাই না তোকেও / কেবল এই মাকে চাই, কেবল এই ভাইকে চাই, বাবা যেন না মরে / শৈশবে, যেন এর চেয়ে সুস্থ দেহ নিয়ে / নিজের খাবার নিজে উপার্জন করে নিতে পারি'।

"বাগিচা" কবিতাতেও একইরকমভাবে নতুন করে ফিরে আসার কামনা ঃ 'আবার তোমার পেটে আসব আমি নভেম্বর দশ চুয়ান্ন-য়। "কবন্ধ বিবাহ" কবিতায় রোগযন্ত্রণার সঙ্গে মিশেছে মায়ের মৃত্যুশোকজনিত বেদনা, আত্মধিক্কারের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণ হাহাকার ঃ

'নির্জলা ও শূন্যজলে মায়ের নামে অন্ন ফেলি আধাসিদ্ধ অন্ন ফেলি / বস্ত্র-সুতোখণ্ড ফেলি শয্যাকুশকাণ্ড ফেলি / ফেলি রে আমি কাদার দলা মেদিনী ফেলে যাই...'

(কবন্ধ বিবাহ ঃ উন্মাদের পাঠক্রম)

"আলেয়া-হ্রদ"-এর শেষ পর্ব থেকে জয় গোস্বামীর কবিতায় মৃত্যু তথা আত্মধ্বংসের যে ছায়াপাত ঘটছিল, হতে পারে তার অন্তরালে ছিল ব্যক্তিজীবনের রোগ-শোকেরই ইঙ্গিত, সেই ধারারই অন্যরকম বিকাশ আমরা পেয়ে গেলাম "উন্মাদের পাঠক্রম" অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাগুলিতে। কিন্তু "উন্মাদের পাঠক্রম"-এর একেবারে শেষে একটা বাঁক নিলো জয় গোস্বামীর কবিতা। যে যন্ত্রণানীল অনুভূতি বিবর্ণ করে দিতে চাইছিলো বাঁচার স্বপ্নকে, মৃত্যুর কাছে পরাস্ত একটা অস্তিত্ব নিয়ে তিনি ভাবছিলেন পুনর্জন্মের কথা—যদি বলি "মৃত্যুমুখ" কবিতায় এইসব আপাত-পরাভবকে তছনছ করে সটান উঠে দাঁড়াতে চাইছেন তিনি (অথচ ঠিক আগেই "কবন্ধ বিবাহ" কবিতায় তিনি বলছেন, "মাটির মানুষ আমি তোদের কোমরভাঙ্গা ভাই!"), যদি বলি "উন্মাদের পাঠক্রম"-এর এই শেষতম কবিতায় অন্য চেহারায় তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তাঁর বলিষ্ঠতম ঘোষণা ঃ

'ওই অর্ধনারীরূপী জলযান / আশ্রয় করেই আজ পেয়েছি নতুন চোখ দেখতে পাচ্ছি এখানেও / বেগশূন্য সমুদ্রবাসকী / ফুলছে, মাথা তুলছে, আমি মৃত্যুতে সমস্ত শেষ বিশ্বাস করিনা, এই / বলে যাচ্ছি ওর শিরশ্চূড়ে / ওঠে ঐ উঠে যায় একা একমাত্র সূর্যচাঁদ....'

(মৃত্যুমুখ ঃ উন্মাদের পাঠক্রম)

এই পরিবর্তনের সঙ্গে যেন খুব সহজেই মিলিয়ে নিতে পারি এ-কবিরই এক ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি ঃ কবির কাজ নয় রোগযন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে বলা। দারিদ্র্য আর অপমানে, দিবসনিশি হীনমন্যতায় মাটিতে মিশে থাকা—না, সে কাজ নয় কবির। আমার ধারণা, এই পরিবর্তন জয় গোস্বামীর কবিতার এক লক্ষ্যণীয় দিকবদল।

জীবনের আলোকিত সঞ্চারপথ থেকে নিতান্ত দৈহিক রোগযন্ত্রণায় সরে আসতে চাইছিলেন যিনি, "উন্মাদের পাঠক্রম"-এর পরিণত পর্যায়ে তিনি পুনঃপ্রবেশ করলেন জীবনের বৈচিত্র্যের উঠোনে। এমন এক মানসিক টানা-পোড়েনের আলো-আঁধারি পেরিয়ে যিনি ফিরে আসবেন জীবনের কাছে, তাঁর কাছে তো এই ফেরা আসলে জীবনকে নবতম রূপে আবিষ্কারেরই প্রেরণা! আর যদি অন্য কেউ না হয়ে সেই ব্যক্তিটি হন এমন এক কবি, যিনি জীবন মানে বোঝেন এক সামগ্রিকতা, যে

জীবন মানে তুচ্ছতম বিষয় থেকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অজানা রহস্যের হাতছানি, যে জীবন মানে রাস্তার অন্ধ ভিখারীর আঁতি থেকে সুপারনোভার বিস্ফোরণ কিংবা অবৈধ গর্ভপাতের সামাজিক অনাচার থেকে মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের অন্বেষণের মতো দার্শনিক প্রত্যয়, তাঁর কাছে এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ যে এবার তিনি ফিরবেন জীবনের আনাচে-কানাচে, বিবর্ণ জীবনযাপনের স্বপ্নভাঙা থেকে বিকশিত জীবনের স্বপ্ননীল মোহানায়!

"উন্মাদের পাঠক্রম"-এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ—"ভুতুম-ভগবান"-এর পাতায় পাতায় আমরা খুঁজে পাবো এই জীবনমুখী ধারার নতুন উদ্ভাস। এখানে কবিতার শব্দ ব্যবহার, কবিতার বিষয় একেবারে সর্বজনবোধ্য স্তরের। এমনকি সমকালীন নানান সামাজিক বিষয়ও উঠে আসছে কবিতায়। কাব্যগ্রন্থের একেবারে সূচনাতেই দেখি বন্ধ্যা সমসাময়িকের প্রতি সুতীব্র বক্রোক্তি ঃ

'সব জননীজন্মদ্বার সেলাই করে বন্ধ / সব পিতৃপুরুষত্ব আংটা দিয়ে আঁটা / তোমার জিভ আমার জিভ জন্ম থেকে কাটা'

এইরকম কঠোর ব্যঙ্গ দিয়ে শুরু করলেন যিনি, সেই ঋংকার বারবার ফিরে আসছে "নুন", "কোষাগার", "ভৌ", "একবিংশ", "গর্ভপাত" ইত্যাদি কবিতার ভেতর। যেমন "নুন" কবিতায় ঃ 'চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে / রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গাঞ্জিকাতে'
অথবা, 'গ্রামে গ্রামে—গঞ্জে গঞ্জে—পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে / আমরা ঋণ নিতে যাচ্ছি ঋণমেলায়, গলা অব্দি খেয়ে'

(কোষাগার ঃ ভুতুম ভগবান)

আবার "ভৌ" বা "গর্ভপাত" কবিতায় ধিক্কার ঝরে পড়ছে এই চারপাশের ভ্রষ্ট সামাজিক বন্দোবস্তটার ওপর। নিরাশ্রয় মানুষের অসহায়তার পাশে ভদ্রবেশী শৌখিন মধ্যবিত্তের শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে তিনি ধরেছেন "ভৌ" কবিতায়, সমালোচনায় বিঁধেছেন এই মানসিক বিকৃতিকে ঃ 'আমরা ও-সব খারাপ জিনিষ, অসভ্য কাজ / আবার বলছি দেখতে চাই না, শুনতে চাই না / আমরা কেবল তর্ক করবো টেবিল চাপড়ে / ভিখিরিদের ভিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা'

(ভৌ ঃ ভুতুম ভগবান)

আমার তো মনে হয়, জীবনকে উল্টে পাল্টে, তন্ন তন্ন করে চিনতে চাইছেন বলেই এসব ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে বারবার কবির চেতনা-কেন্দ্রে। এই সামাজিক

ভ্রষ্টাচারের উল্লেখপর্ব পেরিয়েই তাই আবার কখনো জয় গোস্বামী ফিরে যেতে চাইছেন সত্তর দশকের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গণআন্দোলন প্রসূত রোম্যান্টিক মুক্তিপথের ভাবালুতায়—পরম মমতায়, মানবিক আবেগের স্পর্শে উজ্জীবিত করতে চাইছেন সেই সময়ের উষ্ণতা ; হোক না দিগভ্রান্ত সে জোয়ার, তবুতো সে-এক মঙ্গলময় সুস্থ জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখার ঋতু ! একটা নস্ট্যালজিক দৃষ্টি ছেয়ে ফেলে কবিকে ঃ

এখনো গাছের নীচে শুয়ে আছে গন্ধর্ব দুজন / একদিকে ছিন্ন বেল্ট অন্যদিকে পুরোনো পিস্তল / পাখি এসে ঠুকরে যায়, মর্চে-গুঁড়ো ঝরিয়ে যখন / উড়ে যায় ফের, দূরে, ছেড়ে আসা মৃত রণস্থল

(গন্ধর্ব ঃ ভুতুম ভগবান)

যা আরো প্রসারিত হয়ে ছুঁয়ে যায় আশার প্রত্যন্ত, এ কবিতারই উপান্তে 'শুধু এ-দুজন, এরা, মৃত রণস্থল ছেড়ে এইখানে শুয়েছিল এসে / রোদ-বর্ষা ঠুকরে যায় ; পাহাড়তলীর হাওয়া / কিছু দূরে, উঁচু নীচু টিবি / ওদের শরীর থেকে বারুদ স্খলিত হয়ে দিনে দিনে ঝর্ণাজলে মেশে / বল্ ঝর্ণাজল, তুই এদের খবর কবে তাঁরে তাঁরে নিয়ে পৌঁছে দিবি ?'

(গন্ধর্ব ঃ ভুতুম ভগবান)

শুধুমাত্র সামাজিক চেতনাধর্মী বক্তব্য নয়, "ভুতুম ভগবান"-এর আরো একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা আমাকে সচকিত করেছে, তা হলো আমাদের প্রচলিত ধর্মচেতনার প্রাচীরে কবির আঘাত, যা আরেকরকম দীপ্তি এনে দিয়েছে জয় গোস্বামীর ভাবনায়। সরল আত্মকথনে যে কবি স্বচ্ছন্দে স্বীকার করেন, শৈশব থেকেই তাঁর 'ভগবান মানা'র কথা, যে কোনো ব্যক্তিগত অস্বস্তিকে 'পাপবোধ'-এর সঙ্গে জড়িয়ে ভাবার কথা তিনিই যখন সহজতম ভাষার বাঁধনে উন্মুক্ত করেন ধার্মিকতার প্রচলিত মুখোশ, তখন তা চিন্তার দিগন্তকে মুক্ত করে বৈকি ! বিশেষ করে ধর্ম—এই স্পর্শকাতর বিষয় যখন উঠে আসে কবিতার চেতনায়, তখন তা দাবি করে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, আর এই ময়নাতদন্তের সূত্রেই যখন খুঁজে পাই "দশচক্র", "ধুনি", "শীর্ষাসন", "এসেছি কামদেব", "বিধি" ইত্যাদি কবিতা, তখন খুব সহজেই পেয়ে যাই বিধিবদ্ধ ধর্মীয়তার বিপ্রতীপে তাঁর উচ্চারণ। যেমন ঃ

কী মুখ খারাপ করছে বাপরে বাপ ! মাকে করছে বাপকে করছে করতে করতে /

ফাঁক করছে দশচক্রে ভগবান সব / বাপকে মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে মায়ের সঙ্গে ঠেলাকে মারুতির সঙ্গে / জোর করে শুইয়ে দিচ্ছে এক বিছানায়

(দশচক্র ঃ ভুতুম ভগবান)

অথবা "শীর্ষাসন" কবিতায় পাই দোলাচল মানসিকতার অনবদ্য প্রকল্পন ঃ 'যতক্ষণ শ্বাস রয়েছে—ততক্ষণই আশ / এই আসে তো এই ভেঙে যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস'।

আবার কখনো "রক্তবীজ" কবিতায় বলিপ্রথার হিংস্রতাকে তিনি অনায়াসে ধিক্কৃত করেন অসহায় এক ছাগশিশুর প্রতিবাদের ঢঙে—এইভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর অনুভূতির সংজ্ঞাকে তিনি তুলে আনেন কবিতার মূর্ততায় ঃ 'কিন্তু দুর্গা তিনাশিনী / এবার শেষ কথা শুনে নাও / আমরা এই ছাগজন্মে / নিজেকে বলি দিতে আসিনি !'

(রক্তবীজ ঃ ভুতুম ভগবান)

এসব দৃষ্টান্তের ডালা আরো দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। তবে তা নিষ্প্রয়োজন, যদি আমরা চিনে নিতে পারি জয় গোস্বামীর কবিতার এই বিশেষ ধারাকে, যা সূচিত হয়েছে "ভুতুম ভগবান" পর্বেরই কবিতায় এবং যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাবো পরবর্তী সময়েরও নানান কবিতায়। এ কথা, আমি পুনর্বার বলবো, নতুনভাবে বেঁচে ওঠার ভেতর দিয়ে নিজের সময়, নিজের জীবনকে যখন নবলব্ধ দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন জয় গোস্বামী, তখন চেতনে হোক, অবচেতনে হোক একটা নতুন প্রবণতা উঠে এলো তাঁর কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থের "ভুতুম ভগবান" কবিতায় যার একটা সংহত প্রকাশ খুঁজে পাচ্ছি আমরা, যার পরিণতি উত্তীর্ণ হচ্ছে এক গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় ঃ 'আমি মৃত্যুর পরের অংশ লিখতে চাই।'

(ভুতুম ভগবান ঃ ভুতুম ভগবান)

এই কথাটা খুব সহজ ও সাবলীলভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি, যে দৈহিক রোগজ্বালা, ব্যক্তিজীবনের শোকদাহ জয় গোস্বামীকে একসময় ফিরিয়ে নিতে চাইছিল হতোদ্যম মানসিকতার তামসিকতায়, তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে সব কিছু খুঁড়ে দেখার একটা স্পষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে "ভুতুম-ভগবান" কাব্যগ্রন্থে। একজন সার্থক কবির মানসপটে এমন উত্থান-পতনের উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক, কারণ অনুক্ষণ যিনি সৃষ্টিমগ্ন থাকেন, থাকতে চান, তেমন এক স্রষ্টার চেতনার আকাশে নিরন্তর মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের আনাগোনা—এই দ্বন্দ্বময়

অভ্যুত্থানের সংঘর্ষের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় কবিতার ভূমি। এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, জীবনকে খোঁজার যে তাগিদ আরম্ভ হয়েছিল "ভুতুম-ভগবান"-এ, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা ?"-তে সেই অনুসন্ধানেরই একটা অন্যরকম বিস্তার আমরা দেখতে পাবো। "ভুতুম ভগবান"-এর মধ্যে যেমন উচ্চকিতভাবে ধরা পড়েছে সামাজিক বিষয়-বৈচিত্র্য, অমানবিক কলুষের প্রতি ধিক্কার, ধর্মীয় চেতনার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ, "ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা ?"-র মধ্যে তেমনভাবে এর কোনোটা নেই ঠিকই—পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি কিছু পুরোনো স্মৃতির অনুষঙ্গ, প্রকৃতির দিকে সরে এসে তার সঙ্গে একাত্মীকরণের একটা অনন্য প্রক্রিয়া বা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসার অনুভব। এর সবকিছুই হয়তো "ভুতুম ভগবান"-এর থেকে পৃথক কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এ দুয়ের মধ্যে কোনো মুখোমুখি বিপ্রতীপ সম্পর্ক নেই ; বরং জীবনকে চেনার, জীবনকে ভালোবাসার এটা একটা অন্য পিঠ, বস্তুতপক্ষে "ভুতুম ভগবান"-এর অন্তর্বাহী কাব্যধারার সঙ্গে যা অবলীলায় গড়ে নেয় একটা পরিপূরক সেতু। "ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা ?", জীবনের প্রতি জয় গোস্বামীর এক ভিন্নতর দৃষ্টিক্ষেপণ।

কাব্যগ্রন্থের সূচনাপর্বেই আমরা শুনতে পাচ্ছি কবির কলমে এক অনুতাপের সুর। যেন জীবনের অনেক অনাস্বাদিত অধ্যায় সরে গেছে তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে, আর যা ফিরবে না, এই একমুখী জীবনের বহমানতায়—এ এক গভীর আক্ষেপের ধ্বনি তুলছে কবির কণ্ঠে :

'অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে / হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে'

জীবনকে ঘনিষ্ঠ দূরত্বে দেখার উপলক্ষ নিয়েই যে কবির পথচলা শুরু হচ্ছে, তার প্রথমেই তাঁকে ঘিরে নিল এমন আক্ষেপভার !

জীবনযাপনের অনালোকিত পথগুলি সম্বন্ধে আক্ষেপ বোধ করছেন বলেই হয়তো এই কাব্যগ্রন্থে জয় গোস্বামী প্রত্যক্ষভাবে মুখ ফেরালেন জীবনের সর্বপ্লাবী বৈশিষ্ট্য ভালোবাসার দিকে—এই প্রথম নারী-পুরুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ছুঁতে চাইলো তাঁর কবিতা। আর এই নির্মাণেও তিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর অসামান্য দক্ষতা এই পর্বের "স্নান", "একটি প্রেমের দৃশ্য", "তিল", "আলো-হাওয়া" কিংবা "ছাত্র" ইত্যাদি কবিতায়। আমার মনে হয়, এই আদিম আর

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একজন মানুষের জীবনে যতো সহজভাবে উঠে আসে, ঠিক যেন ততো দূরেই দুঃসাধ্য কবিতার পরিধিতে এর যথার্থতাকে তুলে আনা আর সেই সঙ্গে এর চিরন্তন আবেদনকে ধারণ করা। এইসব দুরূহ কাজকে অনায়াসসাধ্য করেছেন জয় গোস্বামী, যেমন প্রমাণ মিলবে "স্নান" কবিতার নিবিড়তম আকৃতিতে :

'আজ যদি বলি, সেই মালার কঙ্কালগ্রন্থি আমি/ছিন্ন করবার জন্য অধিকার চাইতে এসেছি ? যদি বলি/আমি সে-পুরুষ, দ্যাখো, যার জন্য তুমি এতোকাল/অক্ষত রেখেছ ওই রোমাঞ্চিত যমুনা তোমার ?'

অথবা, যদি আমি ঘরের অভাবে/একবার সাহস করে ওই,/ওই একজনকে নিয়ে গাছের, ধুলোর পথে/সারাদিন লুকিয়ে ঘুমোই !'

(আলোহাওয়া : ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা ?)

জীবনকে চেনার ক্ষেত্রে ভীষণতম আন্তরিক বলেই হয়তো এমন ভিতরের আবেগকে সাবলীল আর শৈল্পিক প্রকাশে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন জয় গোস্বামী। এ তাঁর অন্য এক সার্থকতার দলিল।

এই কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলোর মধ্যে আরো একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে, যা হলো পুরোনো নানান স্মৃতির অনুষঙ্গ। আপাতভাবে এর মধ্যে একটা বিক্ষিপ্ততার ধরণ খুঁজে পেতে পারেন কেউ কেউ, তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে এইরকম ভাবনা নিতান্ত অসংগত কিছু নয়। যে মানসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে কবি পড়েছেন এই কাব্যস্রোতের ভেতর, সেখানে একদিকে রয়েছে যেমন নিজের জীবনের প্রতি একনিষ্ঠতা, অন্যপক্ষে জীবনের ফেলে আসা কক্ষপথের প্রতি মৃদু সন্তাপ — এ দুয়ের অন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে এমন চিন্তা যার ভেতর ঘুমিয়ে থাকবে খানিক নস্ট্যালজিক অনুভব। জীবনের অনেকটা সরে গেলেও, বর্তমানটুকুকে যে কবি মিশিয়ে নিতে পারছেন নিজের বেঁচে থাকার ভেতর, তার থেকেও চুঁইয়ে আসতে পারে একটা সান্ত্বনা আর তৃপ্তির আভাস। এমনই একটা চিন্তা পেয়ে যাচ্ছি যেন এইভাবে, 'মুকুল, এই হাত আমি কেটেই ফেলতাম যদি তুমি এসে/না ধরে রাখতে।'

(১৭ই অক্টোবর : ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা ?)

এই একই ধরতার কবিতা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে "ভোর ১০ই জানুয়ারী", "হোটেলের ঘরে একজন", "২০শে নভেম্বর, সকাল", "২০শে নভেম্বর, সন্ধ্যা",

"১৭ই অক্টোবর" বা "৭ই ডিসেম্বর" ইত্যাদি—এর প্রতিটির পিছনেই জেগে আছে কোনো প্রাচীন স্মৃতির টান। কখনো সে স্মৃতি নিছক কোনো ব্যক্তিগত জীবনের সাড়া দেওয়া ঘটনাক্রম অথবা কখনো প্রকৃতির মধ্যে ভালোলাগার মধুরতম দৃশ্যের মুগ্ধতা; কখনো তা আমাদের কাছে কুয়াশায় মোড়া আবার কখনো সেগুলো ঝকঝকে স্বল্পতায় প্রাঞ্জল। যেমন "ভোর, ১০ই জানুয়ারী"-তে সুখপাঠ্য প্রকৃতির ছবি :

'পাখিরা বসেছে। সাদা আলো আসে পাতার ওপরে।/কে যেন শীতের মেয়ে পিঠে করে কুয়াশার ঝুড়ি নিয়ে তার/ফিরে গেল চা-বাগানে। আর কেউ তাকে এই ভোরে/চলে যেতে দেখেছে কি? না দেখেনি। এই দৃশ্য শুধু বিধাতার।'

এই অনুপম প্রকৃতিলগ্নতা এ-কাব্যগ্রন্থে জয় গোস্বামীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে আপাতভাবে 'প্রকৃতিলগ্নতা' শব্দটি আমাদের মধ্যে যে অভিঘাতের জন্ম দেয়, জয় গোস্বামীর কবিতায় তার প্রকাশ একেবারে সে গোত্রীয় নয়। এই দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি যে সাধারণভাবে চারপাশের গাছপালা-পশুপাখি-নদনদী ইত্যাদির প্রভাবে কবিমন সচকিত হলেও এর বাইরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্য-সংকেত এই কবি ধারণ করতে চেয়েছেন বারবার নিজের মধ্যে। আবার প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের মধ্যে তিনি নিজেকে একাকার করে দিতে চান, কখনো "উদ্ভিদ" হিসেবে নিজেকে একীভূত করে দেন তার সংগে, কখনো তিনি "বাষ্পমেঘ", আবার কখনো তিনি একটি অঙ্কুরিত বীজের স্বপ্ন লালন করেন নিজের ভেতর, আবার তিনিই "গুটিপোকা" হয়ে শোনান তার আত্মকথা। এই ধরনের চেতনার ইতিহাস বাংলা কবিতায় নিতান্তই আনকোরা আর সেইসংগে চিনিয়ে দেয় এক ভিন্নতর অভিমুখ।

"ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা?"-র কবিতার মধ্যেও খুব প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে এই প্রকৃতিপ্রেমিকের দৃষ্টিপাত। তবে বলা বাহুল্য, এ দৃষ্টিপাতের মধ্যে আছে খানিকটা চরিত্রের ভিন্নতা কেননা, কবির কাব্যভাবনার এই পর্বটা আসলে জীবন-যাপনের প্রতিটি সত্ত্বাকে নতুন করে আবিষ্কারের পর্যায়। তবে মূলগত ঐক্য তো নিশ্চয়ই রয়ে গেছে, আর তা থাকাটাই সঙ্গত। এই ধরনের কবিতাগুলোর মধ্যে "প্রীতিভোজ", "বর্ষা", "আলো" কিংবা "ঝাউপাতাকে রুগ্ন কবির চিঠি" উল্লেখ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে প্রাকৃতিক বিষয়াবলী—মনুষ্যেতর অস্তিত্বের প্রতি তার গভীর একাত্মতা। যেমন, অন্তরঙ্গ কথাবলার ধরন "প্রীতিভোজ" কবিতায়,

'....তুমি হেসো না দোয়েল আমি প্রথমদিনেই/তোমাকে চিনেছি গাছে বসবার সময়—কারণ আমি চিরকাল/গাছেদের লোক'

অন্যদিকে,

'ঝাউগাছের পাতা, তোমার নতুন নতুন পুরুষবন্ধু হোক/ঝাউগাছের পাতা, আমি আসতে যেতে কুশল নিয়ে যাই/ঝাউগাছের পাতা, আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো?'

(ঝাউপাতাকে রুগ্ন কবির চিঠি : ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা?)

আপাত অর্থহীনতার সংলাপে আসলে যে কবি চিনিয়ে দিচ্ছেন অন্য রকমের প্রকৃতিসংলগ্নতার বোধ, সেটা হয়তো আমরা অনেকেই বুঝি না। অথচ, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এমন অনিন্দ্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা ইতিপূর্বে হইনি, আর তাই জোর দিয়ে বলবো, এই অনন্যতা সমৃদ্ধতর করেছে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে।

খুব স্বল্প পরিসরে এখানে ছুঁতে চাই আরো একটা কথা, তা হলো মূলত প্রকৃতি-ভাবনায় ফেরার তাগিদ "ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা?" কাব্যগ্রন্থে প্রকট হলেও ধর্মবিষয়ক আক্রমণের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এই বই এর "জড় (শংকরাচার্যের প্রতি)" কবিতায়। অন্যপক্ষে, প্রকৃতিপ্রেম-সমসাময়িকতা-নিজের বৈচেবর্তে থাকার মিলে-মিশে গড়ে ওঠা দীর্ঘ কবিতা "বরষাবন্দনা" এই কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম বিশিষ্ট কবিতার দাবিতে ভাস্বর।

"ঘুমিয়েছো ঝাউপাতায়?"-র পরবর্তী কাব্য পুস্তিকা "এক", যার মধ্যে আমরা পাচ্ছি একটি করে "সূচনা" ও "উপসংহার" কবিতা এবং তার আঠেরোটি উপপর্বে বিন্যস্ত নামবিহীন একটি দীর্ঘ কবিতা। খুব নির্দিষ্টভাবেই এই লেখাগুলির অন্তর্গত হয়ে ফিরে এসেছে কবির মহাজাগতিক চেতনা। সেই আদি সৃষ্টিক্ষণের রহস্যঘন কল্পনা, কবি নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন সেই সন্ধিমুহূর্তে; সেই সময়ের বসবাস, সেই সময়ে তার বেড়ে ওঠা,—এসমস্তই এ-সব লেখার উপজীব্য হিসেবে ঘুরে ফিরে আসছে। "সূচনা" কবিতার সংলাপী ধরনে তিনি বলেন :

—তবে বায়ু কে হয় তোমার?

—সে আমার ছাই হয়ে যাওয়া ফুসফুস।

—তোমার পায়ের পাতা?

—খনির তলায় কয়লা, আমার হাতের পাতা গাছ
এবং আমার চোখ দূরে দূরে প্রবাহিত নদী।

বোঝা যায়, অতি বৃহৎ একটা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অস্তিত্ব এখানে কবির আত্মানুসন্ধানের আধার। পরের লেখাগুলিতে আদিমসময়, সংখ্যার দার্শনিক উৎস নিয়ে কবির একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তারই মধ্যে তিনি বললেন : 'আর ওখানে আমি এক নিমেষে দিগন্ত কালো করা / তিমির-নৌকায় চলি, সে তিমির পেট জলে ভরা।'

তবে এই ধরনের লেখাগুলোর মধ্যে একটা ভাবনাগত প্রাচীর আমাকে অন্তত বাধা দিয়েছে কবিতাচেতনার সঙ্গে একাত্মিত হবার ক্ষেত্রে যেমনটা অন্যক্ষেত্রে ঘটেনি। এবং এই লেখাগুলোর অঙ্গসজ্জাও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায়। তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও আমি ভেবেছি, যে অদৃশ্যপূর্ব জগতের কথা এখানে বিধৃত বার বার, তার চলচ্ছবি কিংবা গতির ওঠাপড়া ততোটা স্পষ্ট নয় আমাদের প্রতিদিনের পা তোলা পা ফেলার চেতনায়, হয়তো সেই অস্বচ্ছতারই দ্যোতনা বহন করেছে এসব লেখার আঙ্গিক।

"কবিতা সমগ্র" বইখানির শেষ পর্যায়ে রয়েছে জয় গোস্বামীর কিছু অসংকলিত কবিতা। কাব্যভাবনার বিবর্তনের বিশ্লেষণে সরাসরি আমি আনতে চাইছি না অসংকলিত কবিতাগুলিকে। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো কাব্যগ্রন্থের দুই মলাটের মাঝখানে যখন কোনো কবি সাজিয়ে দেন তাঁর কবিতা, তখন অবচেতনেও অন্তত তার মধ্যে মিশে যায় একটা ক্রমিক ভাবনা—যার থেকে অনুসন্ধান করা যায় কবিতার ও কবির চিন্তাসূত্রকে। কিন্তু এমন বিক্ষিপ্ত সম্ভার ভেতর থেকে নির্দিষ্ট কোনো ক্রমিক ধারণা খুঁজতে গেলে সম্ভাবনা থেকে যাবে বিপজ্জনক স্খলনের, যার মধ্যে জড়িয়ে যেতে আমি অসম্মত। তবে অসংকলিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়ে যাবো কিছু বিশিষ্টভঙ্গিমার কবিতা এবং লক্ষ্য করবো এ যাবৎ যে সমগ্র চেতনা-ভাবনার স্তর পেরিয়ে এসেছেন কবি তারই ছায়া বারংবার এসে মিশেছে এই কবিতাগুচ্ছে। উল্লেখের মধ্যে আনতে পারি, আদিম পৃথিবীর বুকে মানুষের পবিত্রতম পরিত্রাণ ভালোবাসার অমোঘ প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার "অন্যদেশের কবিতা"কে :

'তোমার কি মনে আছে একদিন অন্ধকারে তোমার ওপর / ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

একটা মাতাল ভালুক / আর আমি ঠিক এইরকম একটা চোখা পাথর দিয়ে / তাকে একবারে কীরকম শুইয়ে দিয়েছিলাম, বলিতে ?'

এরই পাশে পাবো গ্রহ-উপগ্রহ-গ্রহাণু-নক্ষত্রপুঞ্জবেষ্টিত মহাবিশ্বে-মহাকাশের বৃত্তে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ : 'উড়ে গিয়ে দেখলাম আরো কিছু দূরত্বে স্ফুরিত / একটি নতুন গ্রহ / বর্ণালীরা তার থেকে বেরিয়ে / ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ; তবে যাই আরেকটু উঁড়ি তো....'

(উড়ন্ত : অসংকলিত কবিতা)

আবার দেখি, আমাদের পরিচিত প্রতিদিনের আটপৌরে বেঁচে থাকা তার কলমে মমতার বিন্দু নিয়ে ঝরে পড়ে। এই সুন্দর আর সুস্থ বেঁচে থাকাকে যারা নিয়ত বিষিয়ে তোলে, আদর্শভ্রষ্ট রাজনীতির মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় প্রজন্ম, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। এ সবের অন্তর্গত হয়ে ধরা পড়ে "নর্তক" কবিতা, যেখানে সমাজবিরোধীদের তাণ্ডবে বিপন্ন সুস্থ জীবনযাত্রা : 'ছোট্ট রাস্তা, শান্ত ও নির্জন,/ রাত্রি হয়েছে, একটু আগেই একজন পথচারী / একা হেঁটে যায়, হঠাৎ একটা কালো ও লম্বা ছায়া / ছুটে বেরিয়ে এল ওপাশের গলি থেকে / চাপা চিৎকার, দপদপ চোরা দৌড়, / লোকটা এখনো নড়ছে একটু—দাও গো / ওর মুখে কেউ জল দাও / পিচের উপরে ঘন লাল, চটচটে / রক্তের ধারা বয়ে গেছে, গিয়ে মিশেছে নোংরা ড্রেনে....'

এরই বিপরীতে পাচ্ছি এক মানবিক চিত্রের বর্ণনা : 'জলের কিনারে সরু বেণু আর সন্ধ্যার পরে দুজনে / দু-একটি লোক, টানা গাছগুলি, তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে / সারিসারি ট্রাম চলে গেল আলো জ্বালা / ছেলেটির খোলা জামার বোতাম নিয়ে / খেলা করে ওই মেয়েটি চপল, ঝিরিঝিরি চুল কপালে....'

(নর্তক : অসংকলিত কবিতা)

এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতেই থাকবো আমরা, এ সমস্ত কবিতাগুলোয়। দেখবো, চিনবো সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকেই, যা ইতিমধ্যেই নানাবর্ণে ধরা পড়েছে জয় গোস্বামীর কবিতায়। তবু দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইছি না এ লেখাকে শুধুমাত্র এই কারণে যে, এ সবের মধ্যে দিয়ে বিশেষ কোনো অভিমুখ নির্দেশ করতে পারবো না। আগেই বলে রেখেছি, তা হবে ত্রুটিপূর্ণ এবং এক অর্থে অবৈজ্ঞানিক বিচার।

দীর্ঘ পরিক্রমা জয় গোস্বামীর। "ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ"

(১৯৭৭) থেকে "এক" (১৯৯০)—এই এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তাঁর কবিতায় ঘটেছে নানান পটবদল, এক স্রোত থেকে অন্য স্রোতের কিনারায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি বারবার। এই সময়টুকুর যে সমস্ত কবিতা ধরা আছে "কবিতাসমগ্র" বইটির মধ্যে, তারই নিরিখে ধরতে চেষ্টা করেছি কবিতা ভাবনার বিবর্তনের চেহারাটা, এই রচনায়। খুব সংগতভাবেই বিচারবোধ এবং তা থেকে উপনীত সিদ্ধান্তগুলোর ভার সম্পূর্ণতই আমার। আরো বলি, মূলত কবিতাগুলোর চিন্তা ও চেতনাগত অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে তা'ই তুলে ধরতে চেয়েছি নিজের কথায়। এখানে কবিতার আঙ্গিক ও গঠনশৈলী প্রসঙ্গে খুব একটা গুরুত্ব রাখিনি প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই। কেননা, আঙ্গিক বিষয়ক অনুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকলে সম্ভাবনা ছিল ভাবগত বিবর্তনের মূল সুরটার ছন্দপতনের। এই ভয়টা বহুলাংশেই আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। উপরন্তু আঙ্গিক বিষয়টা বেশ অনেকটাই কবিতার বাইরের দিকের ব্যাপার।

যদিও, অস্বীকার করি না, কবিতার মনন ও অঙ্গসজ্জা এ-দুই নিয়েই সামগ্রিক কবিতার প্রকাশ। তবু আঙ্গিক নিয়ে কিছু বলা থেকে নিজেকে মোটামুটি নিবৃত্ত রেখেছি। অনেকেই বলেছেন, "প্রত্নজীব" বা "আলেয়া হ্রদ"-এর জয় গোস্বামী বড়ো বেশি মাঁবিড—হতে পারে ; আমি কিছু বলবো না। কেউ বলেন, ছন্দের বেপরোয়া পরীক্ষায় জয় গোস্বামী সিদ্ধ—হতে পারে। মনের সমর্থন থাকলেও এ সমস্ত প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনুচ্চারিত রইল। বরং এমন হতে পারে, এই অনালোচিত অধ্যায়টা নিয়েই সূত্রপাত হবে দীর্ঘতর কোনো আলাপ ও বিশ্লেষণ।

ভাবনাগত বিবর্তন অনুসন্ধান পর্যায়ে, প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে আমাকে খুব নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে নিতে হয়েছে সেই কাব্যগ্রন্থের মূল নিয়ন্ত্রক স্রোতগুলিকে এবং তারপর সেগুলিকে মেলাতে হয়েছে বিবর্তনের ধারার সঙ্গে। এমন হতে পারে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশ কিছু কবিতা আলোচনার বাইরে অবহেলিত রয়ে গেছে। কেননা, মূলগতভাবে কোনো স্রোত চিহ্নিত করলেও একেবারে নির্দিষ্টভাবেই সর্বদা সেই স্রোতের ধারায় বয়ে যাবে কবির চিন্ততরণী, এমন ভাবা বাতুলতা। বিশেষ করে জয় গোস্বামীর মতো আধুনিক সময়ের বহুমাত্রিক অনুভবের কবির পক্ষে এ প্রায় অসম্ভব। তবুও, কবি-বিশেষের কাব্য-চেতনার বিবর্তনকে সীমায়িত পরিসরে খুঁজতে গেলে এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

কাজেই এই বিশ্লেষণ হয়তো ততোদূর অনুপুঙ্খ নয়, যতোটা হয়তো অনেকে দাবি করছেন। আমার মূল্যায়নের এরকম একটা অস্বচ্ছতার দায় আগে থেকেই স্বীকার করে রাখছি।

সর্বোপরি, এই মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ হয়ে রইলো এই কারণে যে, "কবিতা-সংগ্রহ"-র অন্তর্ভুক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির পরেও জয় গোস্বামীর আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত, যা এ আলোচনার ভেতর আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ মূল্যায়ন খণ্ডিত। ভবিষ্যতে কোনো সুযোগে খুঁড়ে দেখার ইচ্ছা রইলো অবশিষ্ট কাব্যগ্রন্থগুলির ভাবানুগ বিবর্তন ধারাকে।

এই সময়ের বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান প্রতিভূ জয় গোস্বামী দিনের পর দিন আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন আশ্চর্য সমস্ত কবিতা। ইতিমধ্যেই তিনি অনায়াসে নির্মাণ করে নিয়েছেন নিজস্ব কবিতার এক ঐতিহ্য। আমরা যারা তাঁর মুগ্ধ পাঠক, বিমোহিত দৃষ্টিতে দেখেছি শব্দ ব্যবহারের বলিষ্ঠতায়, ভেতরের চেতনাকে প্রসাধনহীন প্রকাশে তিনি কতোদূর সাবলীল। সেই সঙ্গে বুঝেছি, তাঁর বীক্ষা-র প্রসার বহুধা-বিস্তৃত, তাঁর চেতনার ডালপালা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তবু আজও তিনি বলেন এবং ভাবেন যে, এখনো ছুঁতেই পারেননি তিনি কবিতাকে। এখনো সবটাই তাঁর প্রস্তুতিপর্ব। আমরা জানি, এই অতৃপ্তির টানই তাঁকে নিরলস ডুবিয়ে রাখবে সৃষ্টির প্রাচুর্যে। আরো, আরো অনেককাল জুড়ে তিনি কবিতা লিখুন। আমাদের মুখোমুখি করান নতুন নতুনতর দিগন্তের অভিমুখে। কবির তো কোনো অবসর নেই। কবিতার কোনো বিলম্ব নেই।

যে সব রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছি ঃ

- ☐ নিজের জীবন, বীজের জীবন—জয় গোস্বামী (দেশ) ;
- ☐ অরুণ সেনকে লেখা জয় গোস্বামীর চিঠি ও আনুষঙ্গিক আলোচনা (প্রতিক্ষণ) ;
- ☐ ভালোবাসার জন্য লিখি, লেখার জন্য ভালোবাসিনা—জয় গোস্বামী (শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত "সত্যলোক" শারদসংখ্যায় কবির সাক্ষাৎকার) ;
- ☐ চল্লিশের-পঞ্চাশের কবিতা—অরুণ সেন (কবিতার দায়, কবিতার মুক্তি)।

সত্তর-এর কবিতার কয়েকটি বিশেষ ঝোঁক

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সত্তর দশকের শুরুটাই ছিল সন্ত্রাসময় ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় টালমাটাল। এই সময়ে লিখতে শুরু করেন এমন এক কবির ভাষায় বিবরণটা এরকম ঃ

'সত্তর দশক প্রত্যক্ষ এবং উত্তাল রাজনীতির দশক। নকশাল আন্দোলনের আগুনের ভিতর তৈরী হয়েছিল সত্তরের কবিমনের জটিল টেরাকোটা। সবাই মার্কসবাদী ছিলেন না, রাজনীতির প্রবণতারও রকমফের ছিল, ছিল ভিন্নতর বিশ্বাস, সংশয়, উদাসীনতা, নির্লিপ্তি সবই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো না কোনো ভাবে নিজের নিজের দহনাঙ্ক দিয়ে সবাইকে এই আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রভাব এই সময়ের তরুণদের কবিতায় কতটা ফুটে উঠেছিল তা ভিন্ন গবেষণার বিষয়, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যে প্রতিটি কবিমনকে তার নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী এক অ্যাসিড-বিক্রিয়ার সামিল করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

[কবিতার নাসিসাস এবং সত্তরের দশক ঃ রণজিৎ দাশ]

খুব স্বাভাবিকভাবেই কবিতা রচনা করেন, এমন বেশ কিছু তরুণ আদর্শগতভাবে এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন এবং বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে নকশাল আন্দোলনকে মুখ্য বিষয় করে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন। মনে পড়ে, সেই সময় একটি পত্রিকাই প্রকাশিত হত 'সত্তর দশক' এই শিরোনামে (এখনও মাঝে মাঝে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত ঐ পত্রিকার কোনো কোনো সংখ্যা আমাদের চোখে পড়ে)। 'সত্তর দশক'-এ যাঁরা লিখতেন তাঁদের বেশিরভাগই নকশাল আন্দোলনের কার্যকলাপের সঙ্গে মানসিকভাবে কিংবা সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা অধিকাংশ সময়েই হয় উদ্দেশ্যমূলক, প্রচারধর্মী এবং সোচ্চার। কাব্যের সূক্ষ্ম কারুকাজের দিকে কবির যতটা নজর থাকে, তার থেকে বেশি নজর থাকে নিজের আদর্শকে, নিজের মহামন্ত্রকে, নিজের বিশ্বাসকে কবিতার ভাষায় উপস্থাপিত করা পাঠকের কাছে। এই সব কবিতার আবেদন পাঠকের কাছে সবসময় তাৎক্ষণিক। নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এমন একটি কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

'উনসত্তরের কোন এক ঘুমন্ত রাতে/বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় / এক ডজন সশস্ত্র পুলিশ ! / সরকারী রিপোর্টে—তিনজন কনস্টেবল এবজন জোতদার / এবং দুজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর নির্মম হত্যাকারী / অনির্বাণ ; /ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্র / শান্ত স্থির। / কলেজের প্রত্যেক ডিবেটে পেতো প্রথম পুরস্কার....'

(প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত দেহে অনির্বাণ ঃ সুশীল পাঁজা)

কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় কিছু যুবক ছাড়াও আরো এক বিশাল যুবগোষ্ঠী সত্তর সাল থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং অবিলম্বে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এঁরা যে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা নয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের কবিতায় সামগ্রিকভাবে জীবনকে দেখার যে ঝোঁক বা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি তা পূর্ববর্তী দশকগুলির কবিদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম।

সত্তর দশকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে যা ছিল মূলত কবিতা-কেন্দ্রিক। এই পত্রিকাগুলো ছিল, আক্ষরিক অর্থেই, সত্তরের কবিদের প্লাটফর্ম। যেমন, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 'অন্ধযুগ', সমরেন্দ্র দাস সম্পাদিত 'আত্মপ্রকাশ', শ্যামলকান্তি দাশ ও মদনমোহন বৈতালিক সম্পাদিত 'বররুচি', দেবদাস আচার্য সম্পাদিত 'ভাইরাস', গৌতম চৌধুরী সম্পাদিত 'অভিমান', কমল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কৌরব', অরুণি বসু ও প্রিতম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উলুখড়', নির্মল হালদার ও সৈকত রক্ষিত সম্পাদিত 'আমরা সত্তরের যীশু', —এরকম অনেক। এই প্রসঙ্গে এক বিশেষ ব্যাপারে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন বোধ করছি। এটা আমরা জানি যে, তিরিশ থেকে ষাট অব্দি বাংলা কবিতার যে ধারাবাহিক গতি তা ছিল সব অর্থেই কলকাতামুখীন। বুদ্ধদেব বসু-র প্রবাদ-প্রতিম কবিতা-পত্রিকা 'কবিতা'-র ঠিকানা ছিল ২০২, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ ; চল্লিশে 'পূর্বাশা' বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকা সবই প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে। পঞ্চাশের 'কৃত্তিবাস', ষাটের 'কবিপত্র'—এরকম প্রধান পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল অনিবার্যভাবেই কলকাতায়। একমাত্র সত্তর দশকেই এই প্রবণতা ভিন্ন গতি নিল। উপরে উল্লিখিত অনেক পত্রিকারই ঠিকানা ছিল—কলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরের মফস্বল। 'বররুচি' প্রকাশিত হ'ত—সুতাহাটা, মেদিনীপুর থেকে, 'ভাইরাস'—রানাঘাট থেকে, 'কৌরব' জামসেদপুর

থেকে, 'আমরা সত্তরের যীশু' পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েই কলকাতা প্রায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নকশালপন্থীদের অনেক শ্লোগানের মধ্যে একটি ছিল—'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'—শ্লোগান। বাস্তবে এই শ্লোগান কতটা সাফল্য পেয়েছিল, তা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এই শ্লোগান যেন প্রতীকী অর্থেই পরিণতি পায়;—গ্রাম-গঞ্জ এবং মফস্বল থেকে প্রকাশিত একের পর এক উন্নতমানের কবিতা-পত্রিকা যেন কলকাতাকে অধিকার করে নিতে চাইছিল। এবং এই প্রসঙ্গে, এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কবিতা রচনার ব্যাপারে যেন নিঃশব্দে একটা 'বিকেন্দ্রীকরণ' ঘটে যাচ্ছিল। আধুনিক কবিতা শুধুমাত্র শহুরে মানুষ এবং 'এলিট' গোষ্ঠীর চর্চার বিষয় হয়ে রইল না। কবিতা-চর্চা হয়ে গেল সর্বজনীন এবং বিশেষভাবে মফস্বল-কেন্দ্রিক। কবিতার এই গ্রামীণ-সম্প্রসারণের ফলে বিষয়-ভাবনাতে এল নতুনত্ব এবং অনাস্বাদিত বৈচিত্র্য।

পঞ্চাশের কবিদের পাপবিলাস, যৌনকাতরতা ও দুঃখবোধ এবং ষাটের কবিদের নির্বেদ, আত্মবিলাপ এবং আত্মহাহাকার যখন বাংলা কবিতাকে শুধুই নাগরিকমনস্ক ও ক্লিশে-আক্রান্ত করে তুলেছে, তখন একঝাঁক মফস্বলের শক্তিধর কবি যেন এই চাপা, দমবন্ধ, গুমোট পরিবেশ থেকে কবিতাকে মুক্তি দিলেন; পাঠক নতুনভাবে আনন্দ পেতে শুরু করলেন—সবুজ অরণ্যের সতেজ হাওয়ায়, লৌকিক এবং গ্রামীণ জীবনের বিচিত্র উদ্ভাসনে। একটি কবিতায় দেবদাস আচার্যের ঘোষণা: 'আজ তোমাকে দিতে চাই মানুষের কিছু সুখ / ছোটো ছোটো দৈনন্দিন ছড়া, গ্রামীণ গল্প আর বিশ্রাম—।' 'আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম', অথবা, 'রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক / চৌরঙ্গী ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার বদ্বীপ'—এসব ছিল পঞ্চাশের 'মঞ্চসফল' কবিদের আত্মমুগ্ধ বোহেমিয়ানিজমের সপ্রতিভ প্রকাশ। সত্তরের কবিদের কেউ কেউ প্রথমদিকে এই ধরনের সপ্রতিভ ভাষার প্রলোভনে পা দিলেও, সামগ্রিকভাবে সত্তরের কবিতার সুর অন্যরকম, ভান বা চাতুরির ইঙ্গিত সেখানে কদাচিৎ লক্ষিত হয়। নকশাল অভ্যুত্থানের পরোক্ষ প্রভাব ছিল এই—নিজের মুখ থেকে মুখোশ নামিয়ে রেখে নির্মোহ দৃষ্টিতে কবি দেখতে চাইলেন তাঁর চারপাশের জীবনকে, প্রকৃতিকে; অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন নিষ্করুণ ভাবে। রণজিৎ দাশ লিখিত ঐ একই গদ্য থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ আবার আমি উদ্ধৃত করতে চাই পাঠকের সুবিধার্থেই: "....সত্তরের দশকের আগে

পর্যন্ত বাংলা কবিতার 'আমি'তে ঐতিহ্যের আহ্লাদ এবং আধুনিকতার বিষাদ একটা অবরোহী সাযুজ্যে মিলেমিশে ছিল। এই 'আমি'র মূল চালিকা শক্তিটি ছিল কবির নাসিসাস। সময়ের নানা বিচলন অন্তর্নিহিত সত্ত্বেও সমাজ এবং সংস্কৃতিতে কবির ঐতিহ্যপুষ্ট ভূমিকা এবং শোভা বিষয়ে কবিরা আস্থাবান ছিলেন। কবিরা তখনো বাণীপ্রসন্ন, এবং তাঁদের 'আমাকে দেখো' মানসিকতাটি তখনো কাজ করছিল। কিন্তু সত্তরের দশকে কবির এই আত্মভাস্কর্যটি চুরমার হয়ে গেল। বেদি থেকে নেমে এসে কবিকে দাঁড়াতে হল মিছিলের পেছনে, কিংবা কোনো মিছিল-ভীত আড়ালে। সে দেখল চারপাশের মানুষ খবরের কাগজের জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুন এবং খ্যাতির চলন্ত বিজ্ঞাপনবাহক হয়ে। ঘুরে বেড়াচ্ছে টি, ভি.-র দ্বারা দূর-নিয়ন্ত্রিত হয়ে, নিজেরই অজ্ঞাতে। সে বুঝল, এর মধ্যে তার অস্তিত্ব কতটা অবান্তর, তার ভাঙা-ভাঙা পংক্তিগুলি কতটা অপাংক্তেয়। এক কথায়, সত্তরের কবিতায় 'আমি'-র নার্সিসাস-উপাদানটি বিশেষভাবে খর্ব হল; দৃষ্টিকোণ এবং কণ্ঠস্বর দুটোই পালটে গেল।"

নকশাল আন্দোলনের প্রবাহ স্রোতপথে ব্যর্থতার গহ্বরে রুদ্ধ হয়ে গেলেও, সমাজের ভিতকে তা নিশ্চয়ই কিছুটা কাঁপিয়েছিল। প্রশ্নহীন, নির্বোধ বিশ্বাসের এবং আত্মতৃপ্ত অস্তিত্বযাপনের বদলে এসেছিল অবিশ্বাস এবং আত্মসন্দেহ। মূর্তি ভাঙার আন্দোলন যেন প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছিল জীবনের সবরকম বানিয়ে-তোলা 'মিথ'-এর ভাঙচুরের মধ্যে। সত্তরের কবিদের কেউ কেউ সমাজে নিজের অবস্থানটিকে নির্মোহ বিশ্লেষণে বুঝে নিতে চাইলেন—'শুধুই ভুল ইতিহাস আর নন্দনতত্ত্বে আমাদের লাইব্রেরীগুলি ভরে উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় যে মগজ গড়ে দিচ্ছে সে খুব ভয়ঙ্কর মগজ, যারা নতুন এক শোষণ পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে, আর একচেটিয়াভাবে জনরুচিকে নিয়ন্ত্রণে এনে আমার মতো এক শ্রমিক সন্তানকে অত্যন্ত হীন চক্রান্তে ব্রাত্য বলে ঘোষণা করছে—'।

(দলিল : দেবদাস আচার্য)

এবং ঐ একই কবিতায়: 'এ বড় কঠিন দিন, বড় বিভ্রান্তিকর সময়, চৈতন্যকে জাগ্রত করার পক্ষে এ বড় দুঃসময়, যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয় আমাকে বিমূঢ় করে দিচ্ছে, এই জটিল সময়ে খুব শান্তভাবে নিজের অবস্থান বুঝে নিতে হবে এখন, আমি জানি।'

(দলিল : দেবদাস আচার্য)

জীবনের রূপকল্প 'মিথ'—ছিন্নভিন্ন ; সন্ত্রাস, অর্থহীন হত্যা ও রক্তপাতে সময় তখন প্রবলভাবে দুঃসময়, এবং অস্তিত্বের শিকড়ে মূল থেকে পড়েছে চোরাটান। সব মিলেমিশে এক অসহ্য যন্ত্রণাবোধ এবং নিরাপত্তাহীনতার ভয় সত্তরের উচ্চারণকে করে তোলে হাহাকারময় এবং শ্বাসরোধী! রণজিৎ দাশ আমাদের জানান ঃ 'হিজড়েদের নাচের ভিতর আমাদের জন্ম,/আমাদের শরীর আদালতের কঙ্কাল' (ঝড়)। সেই সময়ের সন্ত্রাসের বিবরণ আমরা পাই অনেক কবিতায়, কখনো প্রচ্ছন্ন রূপকে, কখনো ইঙ্গিতে।

যেমন ঃ ক. "জানে এটা ভয়ঙ্কর একান্তর সাল।/খাবার আগলে নিয়ে বসে আছি, ওরে/শমী খেয়ে গেল না তো! দেখ্ একটু'—কাল-/সাপ এসে ঘুরে যায় বাড়ির ভিতরে,/কয়েকটি ছেলে এসে ওকে খুব ভোরে/ডেকে নিয়ে চলে গেল, আজকে নদীর/পাশে ওর দেহ পড়ে...."

(কালো ত্রিভুজের আস্তরণ/আর্ট ঃ জয় গোস্বামী)

খ. 'যে দেশে এলাম, মরা গাছ চারিদিকে/ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল/ পৃথিবীর শেষ নদীর কিনারে এসে/নামিয়েছি আজ জননীর কঙ্কাল— ।'

(সৎকার গাথা ঃ জয় গোস্বামী)

গ. 'বলবে সেই মধু সামন্তের কথা, যে টিপছাপ নিয়ে কেড়ে নিয়েছে তোমার একফোঁটা জমি আর রিলিফের টাকায় কেমন চক-মিলোনো বাড়ি উঠেছে তার? বলবে সেই সন্ধিপুজোর রাত্রির কথা, ঢাকের শব্দের আড়ালে কারা যেন সেবার এসে গলা কেটেছিল মধুর দাদার? বলবে তোমার বড় ছেলেটার কথাও? কণ্ঠ হবে, তবু বলবে কেমনভাবে তাকে খুঁচিয়ে মারল পুলিশ?'

(অমর সার্কাস ঃ গৌতম চৌধুরী)

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে সত্তরের আর এক কবি অভিমানে বলেন ঃ 'ভাবতে অবাক লাগে, সেই কবে উনিশশ পঞ্চান্নয় আমি জন্মেছি/ অথচ আজ পর্যন্ত একটিও যথার্থ রাজনৈতিক দল আমার চোখে পড়েনি,/একটিও যথার্থ ভালোবাসা কিংবা একটিও যথার্থ বন্ধু/আমার লক্ষ্যগোচর হলো না—/শুধু রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়ে গেছে,/ভালোবাসার সংখ্যা বেড়ে গেছে,/বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে গেছে।/প্রত্যেকদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এলেই আমি

বুঝতে পারি/এখানে আমার দাঁড়াবার মতো আজো/স্থির কোনো মাটি নেই, সত্য নেই।'

(অস্থির ঃ সুজিত সরকার)

পাঠকের প্রতি আর এক কবির সতর্কবার্তা এরকম ঃ 'আমাদের গল্পে কোনো রাজা নেই, রাণী নেই ;/আমাদের গল্পে শুধু মৃত্যু আর হাহাকার।/শ্মশানে চিতার পাশে কিভাবে যে পুড়ে যাই,/কিভাবে যে প্রতিদিন লাখে লাখে মানুষ, সংসার—/আমাদের গল্পে শুধু তার কথা আছে।/দিন এসে বিদ্রূপে হাসে,/রাত্রি তার আগাম বিশ্বাসে/ঘন অন্ধকার খেলা আমাদের গল্পে দিয়ে যায়।/আমাদের গল্পে কোনো দ্রোহ নেই, শ্লাঘা নেই,/আমাদের গল্পে প্রেম হাঁটু মুড়ে বসে।'

(আমাদের গল্প ঃ প্রমোদ বসু)

একটু খতিয়ে দেখলেই প্রমাণ হবে,—সত্তরের কবিতায়,—'প্রেম হাঁটু মুড়ে বসে'—। 'প্রেম' শব্দটির প্রতি এই সময়ের কবিরা সবসময়েই বিদ্রূপের চোখে তাকান। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে রুপোলী পর্দায় প্রদর্শিত সহজ ভালোবাসাবাসি আর সম্ভব নয় ; কেননা জীবনের ভিত্তিমূল নড়ে গেছে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জটিল এবং অভিসন্ধিময়, বাণিজ্য-ভিত্তিক এবং মিডিয়া-প্রভাবিত। ঘৃণা আর বিদ্রূপ, ক্রোধ আর চাপা হাহাকার এসবই মূলত প্রকাশ পেয়েছে সত্তরের উচ্চারণে। একের পর এক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

ক. 'মানুষের কোমর আর তেমন সোজা নেই, আগেকার মতো / প্রত্যেকের ছোট মেয়ে ভালোবাসার বিবাহের পর ক্রমশই ভালোবাসাহীন'

(সাড়া ঃ অরণি বসু)

খ. 'মানুষের নিকট নিজেকে মেলতে শুরু ক'রেছিলো মানুষ / সে অনেককাল, অনেকদিন আগেকার কথা ; /প্রথমে বেরুলো পাপ, মানুষ কামড়ে ধরলো মানুষকে/ প্রথমে বেরুলো ক্রোধ, আগুন মানুষ ছুটলো আগুন মানুষের কাছে / প্রথমে বেরুলো কাম, মানুষের পালক ছাড়িয়ে, মানুষের / মাংস খেলো মানুষ ;'

(প্রেম ঃ ব্রত চক্রবর্তী)

গ. 'সহবাসে সুখ নেই, উদরপূর্তির পরে যে উদ্গার / প্রথাগত, তার চোঁয়া ঢেউ আছে, শান্তি কিছু আছে ; / সুনির্ভর ওঠানামা ভালবাসা নামে পচা শব /

রমণীয় বলে জানে কালু ডোম....'

(পরিত্রাণ বর্ণমালা ১ ঃ সোমক দাস)

ঘ. 'আমি চণ্ডাল, সরে যাও
তুমি আমাকে চেনো না নারী
আমি ঘৃণার ভিতর দিয়ে
গায়ে থুতু নিয়ে বড় হয়েছি।'

(লাল মাথা ঃ সুবোধ সরকার)

এবং আর এক অমোঘ উচ্চারণ ঃ

'অনিবার্য ব্যর্থ প্রেম আমাদের—বিচ্ছেদে বা নিষ্ঠুর বিবাহে'

(আর কোন্‌খানে আছে ঃ রণজিৎ দাশ)

'শান্তি কোথাও নেই, হে শালিক, অমল নিষ্পাপ / অর্থহীন উড়ে যাও তাপদগ্ধ বন্ধ্যা আকাশে / সমস্ত ভুবন শুধু বৈতরণী এপার-ওপার'—এই আক্ষেপ করেছিলেন সত্তরেরই এক কবি। আর সেই 'শান্তি'-কে উদ্দেশ্য করে জয় গোস্বামী তীব্র রাগে বলেন ঃ 'শান্তি, শান্তি / ঠাণ্ডা, ভ্যাবলা, শান্তি / শান্তি, শান্তি / শান্তির আলুভাতে / একমাত্তর খাদ্য / শান্তি, শান্তি / শান্তির মরা লিঙ্গ / চুষতে আমরা বাধ্য—।'

বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়ার বিক্রম ঠিক মতো বলতে হ'লে, এই দশকেই একটি পরিকল্পিত আকার নেয়। সত্তর-একাত্তর সাল থেকে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে টি. ভি.-র চলন শুরু হ'য়ে যায়। এবং টি. ভি.-র বিনোদন অনুষ্ঠানগুলি নিঃশব্দে, উইপোকার মতো ধীর গতিতে মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক জীবনকে যেন খেয়ে নেয়। টি. ভি.-র স্ক্রীনে নানারকম চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের এবং অনুষ্ঠানের আকর্ষণে মানুষ ক্রমশ গৃহবন্দী হতে শুরু করে; ঐ ম্যাজিক-বাক্স ক্রমশ তাকে নিয়ে যায় অসামাজিকতার অন্ধকারে। সত্তরের কবিদের কেউ কেউ টেলিভিশনের এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা এবং কোনো কোনো বিশেষ পণ্যের বিজ্ঞাপনকে ইঙ্গিত করে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, যার পাঠযোগ্যতা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ঃ

ক. 'তারপর একদিন আমাদের বাড়ীতে এলো টেলিভিশন।
সারা সন্ধ্যাবেলা আমরা ব'সে ব'সে দেখলুম পালি গৃহের নাচ;

....
....
তারপর আমি, বাবা, মা,....সেই ঘুমন্ত টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে
ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলুম সারা রাত্তির, নাচতে লাগলুম,
পরবর্তী দিনগুলোয়, সপ্তাহগুলোয়, মাস ও বছরগুলোতে....'

(টেলিভিশন ঃ ব্রত চক্রবর্তী)

খ. 'হামাগুড়ি দিয়ে এসো, টলোমলো পায়ে ছুটে এসো বেবী
গ্যাঙ্গো বেবী, উড়ে এসো, আমাদের কোলে এসো
ফুল হয়ে এসো বেবী, মনোবাঞ্ছা হয়ে ফুটে ওঠো বেবী
সাহেব বাচ্চার মতো ফর্সা পোঁদ, ফর্সা নুঙ্কু দুলিয়ে হৈ হৈ করে
গরীবের ঘরে এসে পড়ো
আমাদের বাচ্চা বড়ো কালো হয়,
ধূপকাঠির মতো সরু হাত পা, আলুর মতো মাথা
নায়েগ্রাপ্রপাতের মতো নাক থেকে শুধু সিক্নী ঝরে
বড় ছোটবেলা থেকে নয়া পয়সা চিনতে শিখে যায়
আমাদের বাচ্চারা জানো বেবী নয়,....'

(গ্যাঙ্গো বেবী ঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়)

মিডিয়ার অলক্ষ্য শাসনে ব্যক্তিমানুষ ক্রমে অসামাজিক, বিচ্ছিন্ন ও একা হয়ে পড়ছে। এ বাড়ির বারান্দার সঙ্গে ও বাড়ির বারান্দার মুখ দেখাদেখি নেই। এমনকি নিজের পরিবারের মধ্যেও মানুষ বিভেদের গণ্ডী কাটছে। যৌথ পরিবারে ফাটল ধরে হয়ে যাচ্ছে এক একটি ছোট, ছোট স্বতন্ত্র পরিবার। সমাজের এই ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে সত্তরের কবি কণ্ঠ পান, নিজের মতো করে চেষ্টা তাঁর সকলকে মিলিয়ে দেবার। এবং এই সুস্থ, সামাজিক ভাবনা প্রকাশ পায় কারোর কারোর কবিতায় ঃ

ক. 'সংসারের মধ্যে থাকতে ভালবাসি, যদিও কখনো / মতান্তর ঘটে, কিছু উষ্ণ কথা কাটাকাটি হয় / রক্তপাত অবধি গড়ায়—তবু এই ভালো, এই / মানুষের মধ্যে থাকা, হাঁটা-চলা, মাঝে মধ্যে এই / মানুষজনকে ডেকে বলা—এসো মিলে মিশে থাকি / একে ও অন্যকে ঘিরে....'

(এসো মিলে মিশে থাকি ঃ অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়)

খ. 'ভাবি, আমার স্ত্রীর কথা/ভাবি, সন্তানের কথা/প্রতিবেশীদের কথাও ভাবি,....'

....

(মোহ : দেবদাস আচার্য)

গ. 'ছেঁড়া সম্পর্কে আবার গিঁট বেঁধে দাও।/ছোট একটি বাড়ী। দুটি তিনটি ঘর।/তবু ঈর্ষায় ঘৃণায় ক্রোধে/একে অন্যের মুখের দিকে/তাকাতে পারে না আর।/তুমি সবাইকে নিয়ে সিনেমা দেখতে চ'লে যাও।/সিনেমা দেখার পর রিকশায় বাড়ী ফিরতে ফিরতে/লক্ষ্য করো/কেমন সহজে এ ওর সঙ্গে আবার মিলে যায়'

(গিঁট বেঁধে দাও : সুজিত সরকার)

আগেই উল্লেখ করেছি যে, সত্তর দশকে মফস্বল থেকে অনেক প্রতিভাবান কবি বাংলা কবিতাকে শাসন করতে এগিয়ে আসেন। ক্রমশ তাঁরা তাঁদের শক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছেন। এবং এখনও দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ ভালো প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ; আবার কেউ কেউ প্রতিষ্ঠার চোখ-ধাঁধানো আলোকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে নিজের বোধ এবং দর্শনের অনুসরণে কাব্যচর্চা করে চলেছেন। মফস্বল থেকে যেসব কবিরা উঠে এসেছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কবিতায় বাংলার লৌকিক এবং গ্রামীণ জীবন বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হবে যে, সত্তরের কবিতায় জীবনের ব্যাপ্তি আরো গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কুমুদরঞ্জন, কিংবা কালিদাস অথবা করুনানিধানের পর গ্রামবাংলার জীবন নিয়ে কবিতা রচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। কল্লোল যুগে এ ব্যাপারে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জীবনানন্দ। যিনি গভীর মমতায় রূপসী বাংলাকে চিত্রিত করেছেন একের পর এক সনেটে। এর পরে ষাট দশক অব্দি বাংলা কবিতায় নাগরিক জীবনের কথাই বারবার ঘুরে-ফিরে উচ্চারিত হয়েছে। মফস্বল জীবনের অভিজ্ঞতা কোনো কবির কবিতাতেই তেমনভাবে লক্ষিত হয়নি। কিন্তু সত্তর দশকের কবিতায় এতদিনকার অবহেলিত সেই মফস্বলই যেন আবার সমাদর পেল। এই সময়ের অনেক কবিই নিজেদের চেনা বিচিত্র গ্রামীণ জীবনকে এবং শ্রমজীবী, দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষকে প্রগাঢ় সহমর্মিতায় জায়গা করে দিয়েছেন তাঁদের কবিতায়। নিচুতলার মানুষেরা যেন কলগুঞ্জন করে দেবদাসের কবিতায় :

'তবলদারেরা বিশাল বিশাল করাত কাঁধে বাড়ি ফিরে আসে সন্ধ্যেবেলা/দেহাতী গ্রামীণ সুরে গান করে কুলি-কামিন, বাঁকি, মুটে, ঝাড়ুদার/হরিজন পল্লীর

রামধনু সামনের পাড়ায় / একজন কেরানী ফুলকপি হাতে গুটি গুটি আসছে, ঐ / আমি এই প্রতিবেশীদের ঐসব চমৎকার দৃশ্যের ভিতরে ছেড়ে দিই, দেখি'

(শিল্প : দেবদাস আচার্য)

দূর গ্রামের শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনের নস্ট্যালজিক বর্ণনা আমরা অজিত বাইরীর কবিতাতেও পাই : 'একদা এই লণ্ঠনের মায়াবী আলোয়/ঠাকুরমা ফোঁড় তুলতেন নকশী কাঁথায়।/ঠাকুরদা চোখে ভারি লেন্সের চশমা ঝুলিয়ে/এই লণ্ঠনের আলোয় পাঠ করতেন রামায়ণ।/আর আমার মা তুলসীমঞ্চে দাঁড়িয়ে/এই লণ্ঠন তুলে ধ'রে আমাকে অভয় দিতেন / যখন ভিনগাঁ থেকে ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যে হ'য়ে যেতো।'

(লণ্ঠন : অজিত বাইরী)

সত্তরের আর এক চিহ্নিত কবি শ্যামলকান্তি দাশ গ্রামবাংলার প্রবহমান অন্তঃস্রোতটিকেই যেন নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। নিজস্ব এক আপাত-জটিল, উপমা-সমৃদ্ধ ভাষায় শ্যামলকান্তি দক্ষ রাঁধুনির মতো মিশিয়ে দেন নানা দেশজ শব্দের বিচিত্র ফোড়ন। এবং তার ফলে তাঁর কবিতার ভাষা ভীষণভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে ও পাঠককে অনাস্বাদিত এক তৃপ্তি দেয়। বাংলা কবিতার ভাষায় নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পেরেছেন এই কবি। উদাহরণস্বরূপ :

ক. 'খড়পচা জলের উপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে অন্ধকার, যেন গ্যাঁটা ভাম।
গর্ত থেকে মুখ তুলছে গুলে মাছের ডিম, হাবলা কেঁচো,
ভসকা মাটির নীচে বুজবুজ করছে জল—
ভাকু মাইতির ছেলে গুড়াবেশ এখন ভূতের মতো
কাঁকুড়ের খেতে জাগছে
তার পাথরচাপা কপালে ফুটে-ওঠা
একটি-দুটি সাঁঝতারার নীল উঁকি ঝুঁকি—'

(সদানন্দ, তাঁর অন্ধকার)

খ. 'একদিন তোমার ওই স্ফুরিত মাঝখানটিতে
রবিবারের সে-এক আচ্ছন্ন চিল রেখে গিয়েছিল
তার কিরিচের মতো তীক্ষ্ম নখ, আর কটুকাটব্যের
দীর্ঘ আঁচড়, আর তোমার এই দুপুরভরা রহস্য

ফর্ফাই করে দিয়েছিল ওপারের এক করিতকর্মা মাছ
ভিতরের শ্যাওলা, কৌড়, উদ্ভিদ ছড়িয়ে দিয়েছিল ডাঙায়—'

(একদিন)

জামসেদপুর থেকে কমল চক্রবর্তী বাংলা কবিতাকে আক্রমণ করলেন আকারিক এবং জঙ্গী এক ভাষায়। কমলেরও লক্ষ্য ছিল বাংলা কবিতার গতানুগতিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে এমন এক কাব্যভাষার জন্ম দেওয়া যা একদিকে নাগরিক, অন্যদিকে বিমূর্ত; কবির উদাসী, পেলব এবং বোহেমিয়ান যে ইমেজ এতদিন চালু ছিল, কমল যেন নিহিলিস্টের উগ্রতায় তা ভেঙে দিতে চাইলেন। কবিকে তিনি পরালেন ভারি গামবুট, হাতে দস্তানা। কবিকে তিনি নিয়ে এলেন ঢালাই কারখানার ছন্দময় কর্ম-কোলাহলের মাঝখানে: 'কবিকে কারখানা দিয়েছে ভারি বুট / মাটি থেকে ছ' ইঞ্চি ওপরে / টুকরো লোহা, ভাঙা মেসিনের দাঁত বাতাসে বাতাসে অস্পষ্ট কার্বন / কবিকে কাছে পেতে চায় / কবিকে কাছে পেতে চায় ঢালাই মিস্ত্রির সংযম / বন থেকে বেরিয়ে আসা ওয়াগন বোঝাই লোহা পাথর—।'

(কবি এখন কারখানায় যাচ্ছে)

কবজির একটা মোচড়ে কমল চেনা পরিবেশকে সুদূরে, মায়াময়, অচেনা ও রূপকথার মত উপভোগ্য করে আঁকতে পারেন:

'রেল কলোনীর ফুর্তিবাজ মেয়েরা/গামবুট পায় সারারাত রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়/খালাসীরা মাথায় বোরা ফেলে ডুবো জাহাজের মত বাড়ি ফেরে/বৃষ্টির মধ্যে ঠিক সময় ভোঁ বাজলে পাড়াটা জাহাজ মনে হয়/চারিদিকে সমুদ্রের আদিম বিবর্ণতা/প্রত্যেক জানালায় স্টিয়ারিং হাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতী/ভারী গামবুটের পেরিয়ে যাওয়া শব্দ/সারাদিন কয়েকটা খালি মদের বোতলে বৃষ্টি ঝরে পড়ে।'

(আমাদের পাড়ায় বৃষ্টির দিন)

সত্তরের আর একজন কবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে আমি এই আলোচনার ইতি টানতে চাই। তিনি হ'লেন পুরুলিয়ার নির্মল হালদার। জোরালো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্মল তাঁর নিজেরই শ্রী-হীন, জৌকজমক-হীন, আভিজাত্য-হীন, অ-নাগরিক বেঁচে থাকাকে মর্য্যাদা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। এবং সেই সঙ্গে বাংলা কবিতায় নিঃসন্দেহে যোগ করেছেন এক নতুন মাত্রা। কিছুটা দেবদাসের অনুসরণে নির্মল বরাবরই তাঁর কবিতায় প্রয়োজনীয় মাত্রায় শ্রেণীসচেতন, ভানহীন এবং সত্যপরায়ণ। দেবদাসের কবিতার মতো নির্মলের

কবিতাতেও শ্রমজীবী মানুষের ভিড়; শিল্পের গর্জনতেলের বিভায় চক্‌চক্‌ করে তাদের মুখ। নির্মলের কবিতায় দারিদ্র্য—লজ্জা কিংবা হীনমন্যতার কারণ নয়; বরং তাঁর পায়ের তলার শক্ত মাটি; এই দারিদ্র্যের অহংকারই তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক করে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনের এমন সব বিষয় নিয়ে নির্মল কবিতা রচনা করেন, যা হয়তো অন্য অনেকের কাছে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। যেমন:

ক. 'উনুনের ছাই নিয়ে মা আমার বাসন মাজছে
সেই বাসন মাজার শব্দ আমি চাই'

(ঘরের পথ)

খ. '....সমস্ত তারা
আমার দিদির খোঁপার তারাফুল
দিদি বন্ধক দিয়ে আর ছাড়াতে পারেনি'

(বিষয়: বন্ধু, বন্ধক)

গ. 'বিধবার আঙুলও আলপনা করে
নিয়ে আসে শ্রী ঘরের ভিতর, চৌকাঠে
বিধবার সাদা সিঁথি আলপনার কোনো রেখা নয়
শুধু রেখা হ'য়ে সূর্যের কাছে চলে যায় প্রতিদিন।'

(দিদি)

ঘ. 'সারা সকাল ঐ যে ঐ মহিলা জলের দিকে হেঁটে যায়
সারা সকাল এই বাড়ি ঐ বাড়িতে জল দিতে হয়
.....জলও আদর ক'রে তার
হাতের আঙুল পায়ের আঙুল
একটু একটু করে খেয়ে ফেলে—।'

(কামড়)***

[***প্রসঙ্গক্রমে জানাই এই গদ্যটি সত্তরের কবিতা সম্বন্ধে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। এই সময়ের কবিতার কয়েকটি চারিত্র্য-লক্ষণ চিহ্নিত করার প্রয়াসমাত্র। নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কিছু কবির কবিতার অংশ ব্যবহার করতে হ'ল। এঁরা ছাড়াও এই দশকে আরও অনেক প্রতিভাবান কবি আছেন। সঙ্গত কারণেই সকলের উল্লেখ এই রচনায় সম্ভব হ'ল না। আশা করি, এ ব্যাপারে কোনো পাঠকই আমাকে ভুল বুঝবেন না।—লেখক]

তাদেউশ রুজেভিচ-এর কবিতা

ভাষ্য ও ভাষান্তর : ভাস্কর চক্রবর্তী

তাদেউশ রুজেভিচ, 'যুদ্ধোত্তর পোলিশ কবিতার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার'—সম্প্রতি, এমন এক মত প্রকাশ করেছেন এক সমালোচক।

স্কুলে থাকতেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন রুজেভিচ। ১৯২১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পোল্যাণ্ডে। ফলে, এক রক্ত-সময়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই কবি। দমবন্ধ পোল্যাণ্ড ছিলো তাঁর চিন্তা-ভাবনায়, ভাষায়। পৃথিবীটা যে শেষ হয়ে যাবে না, এমন কথা, তিনি আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর কবিতায়। চারপাশের মানুষজন যখন প্রায় ম্লান হয়ে আসছিলো, রুজেভিচ তখন আঙুল তুলেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথাবাহিত কবিতার থেকে যাবতীয় অলংকার, কবিত্বপূর্ণ কারিগরি, সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। নিষ্ঠুরভাবে, সরলভাবে, তিনি বধ্যভূমির অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছিলেন, 'পদ্য'কে সরিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'কথা'কে।

বলা প্রয়োজন, 'প্রুফ' কবিতাটির পাঠান্তর আছে। মূল ভাষায় লিখিত বেশ কিছু কবিতার রূপ যদিও শুধু তাকিয়ে দেখেছি, আমাদের স্মরণে থাকুক তবু, কবিতাগুলো ইংরেজি ভাষা থেকে অনূদিত।

উত্তরজীবী

আমার চব্বিশ
বধ্যভূমিতে চালান গিয়েছিলাম
বেঁচে আছি আমি।

পরবর্তী কথাগুলো ফাঁকা প্রতিশব্দ :
মানুষ আর পশু
ভালোবাসা আর ঘৃণা
বন্ধু আর শত্রু
অন্ধকার আর আলো।

মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারদের একইভাবে জবাই করা হয়
আমি তাদের দেখেছি :
ট্রাকভর্তি টুকরো টুকরো সব মানুষ
যাদের আর ফেরানো যাবে না।

ভাবনাগুলো স্রেফ কিছু শব্দ :
পাপ আর পুণ্য
সত্যি আর মিথ্যে
সৌন্দর্য আর কুশ্রীতা
সাহসিকতা আর ভীরুতা।

পাপ আর পুণ্যের ওজন সমান সমান
আমি এটা দেখেছি :
একই মানুষ যিনি উভয়ত
অপরাধী আর পুণ্যবান

একজন মাস্টারমশাই আর এক ওস্তাদকে আমি খুঁজে বেড়াই
তিনিই আমার দৃষ্টি শ্রুতি আর কথাকে মেরামত করতে পারেন
তিনিই ভাবনাগুলো আর বস্তুরাশির আরেকবার নামকরণ করতে পারেন
তিনিই আলো থেকে অন্ধকারকে আলাদা করতে পারেন।

আমার চব্বিশ
বধ্যভূমিতে চালান গিয়েছিলাম
বেঁচে আছি আমি।

নথিভুক্তহীন লিপি

কিন্তু যীশু ঝুঁকে পড়লেন
আর লিখলেন বালির ওপর
তারপর আবার ঝুঁকে পড়লেন তিনি
আর তাঁর আঙুল দিয়ে লিখলেন

মা ওরা এ্যাতোই অনুজ্জ্বল
আর সরল আমাকে বিস্ময়কর কিছু
দেখাতেই হয় আমি ঐসব অর্থহীন
আর তুচ্ছ ঘটনা ঘটাই
কিন্তু তুমি তো বোঝো
আর ক্ষমা করো তোমার ছেলেকে
আমি জলকে মদ করে দিই
মৃতদের জাগিয়ে তুলি
হাঁটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে

ওরা বাচ্চাদের মতো
কাউকে নতুন কিছু একটা সারাক্ষণ
দেখাতেই হবে ওদের
ভাবো কাণ্ডটা

আর ওরা যখন কিছু বলতে আসছিলো কাছে
তিনি ঢেকে দিয়েছিলেন আর মুছে দিয়েছিলেন
অক্ষরগুলো
চিরকালের জন্যে

ধৈর্যর মধ্যে শিক্ষা

(মিশিস্তভ পোরেবস্কি-র জন্যে)

চীনের পাঁচিল
দুটো হাতেরই আঙুলগুলো দিয়ে আমি এটাকে ছুঁয়ে দেখেছিলাম
এই ল্যাণ্ডস্কেপের মধ্যবিন্দু এক পাখির একটা গান
এই শহরের মধ্যবিন্দু এক মহিলার হাসি
ল্যাণ্ডস্কেপটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়
শহরটা হাড়ের থেকে মাংসের সরে পড়ার মতো
একটা হাসি ফেলে রেখে
উধাও হয়

চীনের পাঁচিল
ঘুমন্ত দেবতার পিঠে ওঠার মতো
আমি হামাগুড়ি দিয়ে এটার পিঠে চেপে বসেছিলাম
আমি পাঁচিলটাকে নিজের চোখে দেখেছিলাম
শুরুও নেই অথবা শেষও নেই

একটা সময় ছিলো যখন রমণীরা ক্রীতদাসদের জন্ম দিতো
আপাদমস্তক বন্দী
তারা ইঁদুরকলগুলোই পেটে ধরতো
সমুদ্র
বিশাল আর অগাধ নীল বেড়ি পরাতো যাকিছু ঝরে পড়তো এসে

আমি পাঁচিলটার স্মৃতিচারণ করছিলাম
সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছিলো
এমন লম্বা একটা সময় ধরে বৃষ্টি পড়ছিলো যে
আমি চীনের পাঁচিলটার কথা ভাবছিলাম
ভাবছিলাম লুপ্ত একটা সাম্রাজ্যের কাঠামোর কথা
বুদ্ধ-র হাসির কথা
সবুজ রিবনে বাঁধা বিনুনি ছোট্টো চু লিন
যেমন দেখেছিলো

আমি তলার থেকে পাঁচিলটাকে দেখেছিলাম
এটাকে এক কবির জীবনের মতো
আর এক কেরানীর জীবনের মতো মনে হয়েছিলো
পাঁচিলটাকে আমার কোনোকিছুর মতোই মনে হয়নি
আমি আরেকবার এক-নজরে এটাকে
প্লেনের জানলা থেকে
চোখ বুলিয়েছিলাম

ঐ পাঁচিলটা বিভক্ত করেনি
কিছুই প্রতিরোধ করেনি কিছুই লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো
একটা সময় ছিলো যখন রমণীরা ছোটো আর বিশাল সব

বন্দীশালার জন্ম দিতো
খাঁচাগুলো যেখানে হৃদয় স্পন্দিত হতো
অগাধ সমুদ্র কর্কশ শব্দে বেড়ি পরাতো
উগরে দিতো গোলাপী পায়ের
মৃতদেহগুলো

ঐ পাঁচিলটা একটা বিষয় শিখিয়ে দ্যায়
সেইসব মানুষদের যারা কল্পনা করতে পারে না
বস্তু-কল্পনার
প্রকৃতি

তারা যখন আমাকে জিগ্যেস করতো
কী পাঁচিলটা ঠিক কীরকম
আমি হেসে উত্তর দিতাম
পাঁচিলটা লম্বা আমি এর শুরুও দেখি নি
অথবা শেষও দেখি নি
আর তারপর আমি জুড়ে দিতাম পাঁচিলটা খুবই লম্বা

প্রুফ

কবিতার একটা পঙ্‌ক্তিও মৃত্যু
ঠিকঠাক করে দেবে না
মৃত্যু কোনো প্রুফদর্শিকা নয়
সমবেদনাময়ী কোনো
মহিলা সম্পাদিকাও নয়

যাচ্ছেতাই একটা রূপক অবিনশ্বর

এক ওঁছা কবি যিনি মারা গ্যাছেন
তিনি ওঁছা মৃত কবি একজন

যে বিরক্তিকর মৃত্যুর পরেও সে বিরক্ত করে
আহাম্মক তার আহাম্মকি বকবকানি
কবরের ওপাশ থেকেও চালিয়ে যায়

সারার্থ

আমি জানলার দিকে তাকাই
অন্ধকারে বুঁদ হয়ে পড়ছে
গাছেদের মুকুট সব
নীচে সোনালি
সব শিম
আমি হ্যামলেট বিষয়ে আমার ছেলেকে শোনাই
আমি ভূতটার কথা বলি যে
চিকের পেছনে এক ইঁদুর
এক অমায়িক বকরবকরমশাই
উন্মাদিনী মেয়েটির বাবা

আমি রাজমাতার
মসৃণ আর দুধসমান উরুদুটোর কথা ভাবি
যে রহস্যটা
পরিণতমান ছেলেটা
লুকিয়ে জেনেছিলো
ভালোবাসা তার মধ্যে
জেগে উঠেছিলো আর পচে গিয়েছিলো
ব্যাপারটা বিষিয়ে তুলতে হয়েছিলো
ব্যাপারটা ছেঁটে ফেলতে হয়েছিলো
সুতরাং অন্ধভাবে সে আঘাত করেছিলো তরবারির
ভালোবাসা কামড়ে ছিঁড়ে নিতে হয়েছিলো
সুতরাং সে দাঁত বসিয়েছিলো সেখানে
ব্যাপারটা অন্ধ কুকুরছানার মতো
ডুবিয়ে মারতে হয়েছিলো
সুতরাং সে নিষ্পাপ মেয়েটিকে
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলো

আমি শেক্সপীয়রের জীবনের আবছা খবরগুলো
ছড়িয়ে দিই
১৯৬২-র ৩রা জুলাইয়ে
তবু পৃথিবীর আরেকজন মানুষ
ইংরেজ নাট্যকারের অস্তিত্বের কথা
জানতে পায়
বৃষ্টি পড়ছে দেয়ালের পেছনে
হাসির শব্দ একটা ইঁদুর এলোমেলো ধাক্কা মারছে
বনগুলোয় রুপোলি শ্যাওলা
নিমজ্জিত মানুষের মতো ফুলে উঠছে
স্তব্ধতায় আমি উপেক্ষা করি
প্রশ্নটা
যা ভেনিস রাজকুমার নিজেকে করেছিলেন
আধুনিক মানুষের কাছে এ একটা রসিকতা
বড়োই নিষ্ঠুর আর অশ্লীল।

সমাধান

মুখ শব্দ আর নামেদের
এক চেনাশোনা কক্ষপথে
কাহিল
আমরা বেঁচে থাকি

অন্যরা আমাদের বর্ণনা করেন
আমাদের শ্রেণীবিভাগ করেন
চেপে রাখেন আমাদের

আমরা জানি আমাদের ভাঙতে হবে এটা
নকল বৃত্তটাকে পেরিয়ে
বেরিয়ে পড়ার জন্যে

কিন্তু আমরা থেকে যাই

১৮৮০ সালে এডেন-এ
র‍্যাবোঁ
রকমারি সব বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন
যার মধ্যে
দি পারফেক্ট মেটাল ওয়ার্কার
দি পকেট কার্পেন্টার
অথবা ঐ রকম কিছু
তিনি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন
ইঁট তৈরী আর কাঁচ গলানোর
আর মোমবাতি তৈরীর
খনিবিদ্যার
ধাতু ঢালাইয়ের
রাজমিস্ত্রীগিরির
নর্দমার ময়লা সাফাইয়ের সব
বইপত্তর

হ্যাঁ তিনি সত্যিই
চলে গিয়েছিলেন
তবু তিনিও
ঘরে ফেরার জন্যে টাকাপয়সা
জমিয়েছিলেন
কবিতা নিভে যাওয়ার পর
সত্যিকারের একটা ছিমছাম সংসার চালু করার জন্যে
ভাবনাচিন্তা করেছিলেন
ছেলেকে দেখাশোনার জন্যে
(যে স্বভাবতই সাহসী
এক নতুন মানুষ হতো)
বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে
তাঁর মনোভাবটাকে মজবুত করার জন্যে
যথাযথ পথে
সামরিক চাকরির কথাও ভেবেছিলেন

আর এইরকম আরো কিছু
আর এইরকম আরো কিছু

ব্যাপারটা বেশ

কিন্তু আমাকে বলুন
পঞ্চাশ—ষাট—
আশিবছর বয়সের র‍্যাবো
কী করতেন

কোন্ সব বই
চেয়ে পাঠাতেন তিনি
কোথায় যেতেন তিনি
কী পোড়াতেন তিনি
আর কী বা পরিত্যাগ করতেন।

আমার হাত আমি মুঠো করেছিলাম

আমার হাত আমি মুঠো করেছিলাম
আমি মুঠো করেছিলাম আমার হাতটা
আর ছায়াগুলোকে
থামিয়ে দিয়েছিলাম

তারা হাতের ভেতর
চুপচাপ চলাফেরা করে দ্রুত
তারা আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে
চুঁইয়ে পড়ে

নিষ্প্রাণ সব আগুন
তাঁরা পান করেন এখনো
তাঁরা এখনো কথা বলেন

চিঠিপত্রগুলো আসতে থাকে
ফ্রানৎস কাফকা
১৯১৩-র ১৬ই মার্চ
ফেলিস বাওয়ারকে
একটা প্রেমপত্রে লিখেছিলেন
'রান্নাঘরে একটা চুরি করা সসেজ নিয়ে
ওরা মারামারি করে
আর বিরক্ত করে আমাকে'

মৃত মানুষদের আমি ডেকে তুলি

তারা খোলে তারা বন্ধ করে
খোলে
দরজাগুলো

পরিত্যক্ত ঘুঘুর বাসাগুলোয়
হলুদ সব প্রজাপতি
আর মাকড়সার জালগুলো
শুষে নিচ্ছে সূর্যকে

রোদমাখা ইটালিতে
আমি তোমাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম
কিন্তু গত সপ্তাহে তুমি মারা গ্যাছো
আর কবর দেওয়া হয়েছে তোমাকে

জ্ঞান

কোনোকিছুই কখনো ব্যাখ্যা করা
যাবে না
কোনোকিছুই সমান করা যাবে না
কোনোকিছুই পুরস্কৃত করা যাবে না

কোনোকিছু
কখনোই না

সময় কিছুই সারিয়ে তুলবে না
আঁচড়গুলো কোনোই দাগ বসাবে না
একটা শব্দ আর একটা শব্দের
জায়গায় এসে বসে পড়বে না

কবরগুলোকে ঘাস ঢেকে দেবে না
মৃতেরা মারা যাবে
আর জেগে উঠবে না কখনোই

পৃথিবীটা কোনোদিনই শেষ হয়ে যাবে না

কবিতা নিজেকেই হেঁচড়ে নিয়ে
যাবে
আর্কেডিয়ায়
অথবা বিপরীত দিকে

ক্যানিবলকে চিঠি

প্রিয় ক্যানিবল
বিদ্বেষে ভুরু কুঁচকে
মানুষটার দিকে তাকাবেন না
যিনি জিগ্যেস করছেন
ট্রেনের কামরায় কোনো বসার জায়গা আছে কিনা

প্রিজ একটু বুঝুন
অন্য মানুষদেরও
দুটো পা আর পাছা আছে

প্রিয় ক্যানিবল
এক সেকেন্ড
কমজোরী মানুষের পা অবজ্ঞায় মাড়িয়ে যাবেন না
দাঁত কড়মড় করবেন না আপনার

প্রিজ একটু বুঝুন
হাজার মানুষজন আছে আর আরো হাজার মানুষজন

আসবে একটু পেছনে সরুন
জায়গা করে দিন

প্রিয় ক্যানিবল
সমস্ত মোমবাতি জুতোর ফিতে নুডল্‌
কিনে ফেলবেন না
পেছন ফিরে বলবেন না ঃ
আমি আমাকে আমার আমাদের
আমার পেট আমার চুল
আমার পায়ের কড়া আমার ট্রাউজার
আমার বৌ আমার ছেলেমেয়ে
আমার মতামত
প্রিয় ক্যানিবল
আমরা একে অপরকে পুরোটা গিলে ফেলবো না ও. কে.
কেননা আমরা জন্মাচ্ছি না আবার
সত্যিই

কে কবি

তিনি কবি যিনি পদ্য লেখেন
আর তিনি যিনি পদ্য লেখেন না

তিনি কবি যিনি বেড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন
আর তিনি যিনি নিজেকে জড়িয়ে নেন বেড়িতে

তিনি কবি যিনি বিশ্বাস করেন
আর তিনি যিনি নিজেকে বিশ্বাসের কাছে আনতে পারেন না

তিনি কবি যিনি মিথ্যে বলেছেন
আর তিনি যাকে মিথ্যে বলা হয়েছে

তিনি যাঁকে পতনের দিকে ঝোঁকানো হয়েছে
আর তিনি যিনি নিজেই তুলে ধরেন নিজেকে

তিনি কবি যিনি ছাড়তে চেষ্টা করেন
আর তিনি যিনি ছাড়তে পারেন না

১৯৬৩ সালের একটা স্বপ্নের স্মৃতি

লিও তলস্তয়কে
আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম

তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন
সূর্যের মতো বিশাল
কেশরে
জটপাকানো চুল

সিংহ

আমি তাঁর মাথাটা
দেখেছিলাম
ঢেউ খেলানো সোনালি টিনের মুখ
যার নীচ দিয়ে
অটুট আলো বইছিলো

হঠাৎ তাঁকে নিভিয়ে দেওয়া হলো
কালো হয়ে গেলেন তিনি
আর তাঁর হাত আর মুখের চামড়ায়
এবড়ো খেবড়ো
ওক গাছের ছালের মতো
ফাটল ধরেছিলো

আমি তাঁর কাছে প্রশ্নটা রাখলাম
'কী করতে হবে'

'কিছুই না'
উত্তর দিয়েছিলেন তিনি

তামাম খাঁজ আর ফাটলের
ভেতর দিয়ে
আলো বইতে শুরু করলো আমার দিকে
এক অগাধ উদ্ভাসিত হাসি
জ্বলতেই থাকলো

বোধের ভাষা, সময় ও তাঁবু-বিষয়ে প্রাথমিক কিছু লাজুক কথোপকথন

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ও'র, অর্থাৎ রণজিৎ দাশের টুকরো টুকরো অনেক লেখাই পড়া ছিল আমার। যেহেতু খুব একটা সুলভ নয় ও'র বইগুলো, চাইলেই যে পাওয়া যাবে তা সম্ভব নয়, ফলে ঐ টুকরো টুকরো লেখাগুলো, এবং গোটা বই বলতে 'জিপসীদের তাঁবু' একমাত্র, এ-ই বলতে গেলে সম্বল ছিল আমার। তবু তা-ই পড়তে গিয়ে, বা যখন এখানে-ওখানে পড়তে পেয়েছি ও'র কোন লেখা, তখনও টের পেয়েছি এক জাতের বৈদ্যুতিক উদ্ভাস এবং আমার অবাক লেগেছে এ-দেখেও যে, গত এত-গুলো বছর, সেই সত্তর থেকেই, প্রায় নিরবচ্ছিন্ন লিখে এসে, এবং এই মাপের সমস্ত ঝকঝকে লেখা লিখে এসেও, আমাদের পাঠকমহলে যতটা হবার ছিল, তার কণামাত্রও বোধহয় আগ্রহ ও'র বিষয়ে তৈরি হয়নি। এবং আজ যখন ও'র সম্প্রতি বেরুনো 'বন্দরের কথ্য ভাষা' আর বাকি বইগুলো আমার সন্ধ্যা এবং দুপুরকে গ্রাস করে নিল বেমালুম, আমি দেখে চমকে উঠেছি ও'র প্রতিটি বই-ই, কী আশ্চর্য, প্রকাশ করেছেন উনি নিজে, কেবল প্রথম 'আমাদের লাজুক কবিতা' বাদে! এই '৯৩-র বাংলাদেশে বসে হয়ত এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা এ-দেশে নিয়ম এটাই, তবু আমার, বলে রাখি, অবাক লেগেছে। লেগেছে, এবং টের পেয়েছি রণজিৎ কবিতাকে অস্ত্র করে সেই কিছু কথাই বলতে বসেছেন, এই সময়ে এসেও, যখন কবিতা, কেন সবকিছুরই একটা বাজারদর নির্দিষ্ট রয়েছে এখনও, যার কোন বাজারদর তৈরি করা যায়নি। বলতে কি, কবিতার ঢের বাইরেকার এই ব্যাপারটাই প্রথমে এই বই চারটে হাতে বসে-থাকা-আমাকে বিব্রত করে তোলে। পাঠক হিসেবে আমার আজন্ম-অভ্যাসকে গুছিয়ে নিতে হয় আমায় এরও পরে, তৈরি হতে হয় সেই প্রভার মুখোমুখি হবার জন্য, যা আগেও ক্বচিতে ছুঁয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু এতটা নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতো করে নাড়িয়ে যায়নি। আপাতত, রণজিতের কবিতা বিষয়ে এই আমার ভূমিকা।

রণজিতের কবিতার যে জগৎ, যে দুনিয়া ও'র লেখার, বলতে কি, তা আমায় এক অর্থে খানিকটা বিভ্রান্ত করে দেয়। কেন এমনটা হয় একটু বলে নিই।

রণজিৎ এবই সঙ্গে 'কবিতা' লেখার জন্যে তাঁর যে একটা প্রচেষ্টা আছে, অর্থাৎ এ-লেখাগুলো যে প্রচেষ্টার ফসল, কোন প্রেরণাজাত নয় যে এগুলো, এ-বিষয়ে আমাদের বাধ্য করেন ওয়াকিবহাল হতে এবং একসময় খেয়াল করে বিহ্বল হতে হয় যে, যে-প্রচেষ্টা বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল করলেন এই তাকেই কি অনায়াস ব্যঙ্গ করতে করতে উনি গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন সেই সীমানায় যার ঠিক পরে নেই, আর কিছু নেই!'[১] এবং ঠিক এইখানেই আমার সামনে দেখি উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেই সুপ্রাচীন এবং আর্কেটাইপাল থীম 'persecution of the fool' যেটা বলতে গেলে যাবতীয় পুরনো গাথায়, এদেশ ও বিদেশ সর্বত্র তো বটেই এমন কি এই আজকেও যাঁরা সেসব পুনর্বার তুলে ধরতে চলেছেন নতুন ব্যাখ্যায় ও আবহে সেখানে পর্যন্ত অনাবিল ছড়িয়ে রয়েছে, এটাই আমার মনে হয় রণজিৎকে নিয়ে আসে ওঁর বিষয়ে এবং ওঁকে বাধ্য করে লিখে ফেলতে ওঁর এইসব বইয়ের বিবিধ লেখাগুলি। উনি ব্যাখ্যা করেন না, কবিতায় তা করা যায় না, আর করার কথা বোধহয় নয়ও, তিনি উন্মোচন করেন। উন্মোচন করেন সেই বৈদ্যুতিক তরবারি যার নিচে সেই কবে বুনুয়েল সাহেব একদা কল্পনা করতে পেরেছেন ওঁর 'ভিরিদিয়ানা'-র দৃশ্যটি যে, খেতে বসেছে একদল সততা-অসততার সীমানায় যাদের তাঁর ঘৃণা সেইরকম মানুষ, ও-দেশের ফিলমুবোদ্ধা সম্প্রদায় যাদের চিহ্নিত করতে পারেন একটিই শব্দে যে 'Rogue'; এবং ক্যামেরা ওদের ধরে দ্য ভিঞ্চি-র 'লাস্ট সাপার'-এর ভঙ্গিতে। এবং সেই তরবারির নিচেই আমরা দেখতে পাই সেই মূর্খকে, যে বলছে 'প্রতিশোধহীন একটানা অপমানের মধ্যে এই যে কুমড়ো-পটাশের মতো টিঁকে আছি, তা বলা যাক, কবিতা লেখার অজুহাতে।'[২] এই যে 'টিঁকে থাকা,' 'কুমড়োপটাশের মতো,' এ-ই, আমি বলছি, রণজিতের আবহশব্দ, যা কাড়ানাকাড়ার তীব্রতা নিয়ে বারবার বেজে ওঠে এবং আমরা দেখতে পাই একটি মূর্খ, যার জগৎ বিষয়ে, দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রায় দোনকিহোতের মতই আবেগী মূর্খতায় লাঞ্ছিত এবং উজ্জ্বল, যে ল'ড়ে এবং আহত হয়ে চলেছে। আমার উপলব্ধিতে এ-ই, এ-টুকুই রণজিতের কবিতা—এই ল'ড়ে চলা এবং আহত হওয়াটা ছেদহীন।

তাহলে কোনখানে রণজিতের লেখার মূল পয়েন্টটাকে চিহ্নিত করলাম আমি? করলাম, ঐ যাকে বলছি 'Rogue', তাদের যে ভঙ্গি, যে অ্যাটিচ্যুড, জীবনের প্রতি যে সদর্থক হিংস্রতা, যাকে এমনকি 'মায়াময়' বললেও কম বলা হয়,

তারই অন্তঃস্থলে। এবং বলতে বাধা নেই, এ-ই বোধহয় সেই ভূমি যেখান থেকেই সম্ভবত বলা চলে 'ব্যাকরণহীন জীবন'-এর কথা, 'ক্যাবারে-নর্তকীর পরচুলার মতো উদ্দাম ঝলমলে রুড জীবন'-এর কথাও এমনকি, একমাত্র। আর এই যে ভূমি, এ যদি আদৌ কোন ভূমি হয়, তাহলে সেখান থেকে কীভাবে একজন মানুষ বহে যেতে পারেন সৃষ্টির দিকে? প্রশ্ন হতেই পারে। এবং যদি হয় তাহলে জবাব কী হতে পারে সেখানে পরে আসছি, বরং আগে পরিষ্কার করা যাক এই জায়গা থেকে যদি কোন লেখার জন্ম হয় তাহলে তার চরিত্র কী হতে পারে, সেটুকু। রণজিৎকে এর জবাবে আমি বলব লক্ষ করতে, দেখে নিতে বা অনুসরণ করতে সেই রণজিৎকে, যাঁর পাশাপাশি আমরাও দেখে ফেলেছি 'আমাদের অফিসবাড়ির কোল ঘেঁষে চাঁদ ওঠে,/রতিপ্রস্তুতির রবে জমে ওঠে বেশ্যাপল্লী, বামন মুল্লুক,/সরু চোখে পরস্পর মুখ দেখি—কালো থাপ্পড়ের দাগ/প্রত্যেকের গালে—',[৩] আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি সেই মেয়েটিকে, তার 'পাখির বিষ্ঠা প'ড়ে প'ড়ে জমে ওঠা'[৪] শাদা চাহনিকে, টের পেয়েছি 'প্রেরণা নারীতে নেই, আপেলে রয়েছে।'[৫] [এই দেখে ফেলা, এই 'উপলব্ধি', এ তত্ক্ষণই ততটা-বিপজ্জনক নয়, যতক্ষণ রণজিৎ যাকে বলবেন: 'চেয়েছিলাম' কথাটির অধঃপতন থেকে চেখে-উঠতে[৬]-পারার 'বিড়াল-সাফল্য'[৭] আর স্বপ্ন ও মৃত্যুর যে দেয়ালদুটি তার মধ্যবর্তী 'স্মৃতি, বিস্মৃতি, যৌন অবসেশন, মুর্গি-মসল্লম, কাশ্মীর ভ্রমণ, বৌ, বই, চর্মরোগ, পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র, টর্চলাইট এবং এমনকি আত্মানুসন্ধান'[৮]—তা নিয়ে নিজেকে আড়াল করা চলে, বলে রাখা ভাল বোধহয়। যদিও কথা হল, যতক্ষণ আড়ালটি রয়েছে রণজিতের বিদ্রূপের চাবুক, ওঁর হিংস্রতার মায়া ও মোহময়তার যে প্রকৃত রূপ তা নিজের আবরণ উন্মোচন করবে না বা করার ইলিউশন তৈরি করবে—যেখান থেকে রণজিতের বহিরঙ্গের স্মার্টনেসেই কেবল চোখ ধাঁধিয়ে যেতে বাধ্য, ওঁর লেখার মূল যে ভিত্তি তার থেকে ঢের দূরে] আসলে, রণজিৎ এ-ই যে অ্যাটিচ্যুডটা, একেই রচনা করেন, আমি দেখি। ওঁর লেখাগুলির মধ্যে দিয়ে এই এটাই, নজরে পড়ে আমাদের[৯], হয়ে উঠছে কবিতা, ওঁর। হয়ত আমার এ-বক্তব্যে আপত্তি তোলার লোকের অভাব হবে না, কিন্তু জীবনানন্দ পর্যন্ত ওঁর 'উত্তরৈবিক বাংলা কাব্য' লেখায় কবির যে দায় চিহ্নিত করেছিলেন[১০] তা-ও যদি মনে রাখি আমরা, তবে ও-আপত্তি নিজের ভিত্তিহীনতার কারণেই নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য, ও-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আর। বরং দেখা যাক এই অ্যাটিচ্যুডেরই বিবর্তন পথটিকে, যা ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত সময়ে 'হয়ে' উঠতে পেরেছে।

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৫তে মিন্না কাউটস্কিকে চিঠিতে[১১] যে কথা লিখেছিলেন এঙ্গেলস, তা দিয়েই লেখার এ-পর্ব আরম্ভ করা যাক। কাউটস্কিকে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, একজন ঔপন্যাসিকের কাজ হল তাঁর রচনায় প্রামাণ্য সামাজিক সম্পর্কগুলোর নিখুঁত চিত্রায়ণ, যার মারফতই কেবল ধ্বংস হতে পারে ঐ সব সম্পর্কের প্রকৃতি-বিষয়ে জীর্ণ সমস্ত প্রচলিত ধারণামালা, ছিন্ন হতে পারে বুর্জোয়া সমাজের মিথ্যে ও প্রবঞ্চনাময় আশাবাদের জাল, উঠতে পারে চলতি অবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে দুর্বার সব প্রশ্ন। এঙ্গেলস সাহেবের মতে, 'তাহলে, শুধু তাহলেই সেই ঔপন্যাসিক শিল্পের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। তাতে যদি তিনি সমস্যার সমাধান না-ও দিতে পারেন, বা কোন নির্দিষ্ট পক্ষ না-ও নেন, তবু তাঁর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই।'[১২] এ-ই বলেছেন এঙ্গেলস এবং রণজিৎ কী করছেন? আমরা আগে 'আর্কেটাইপ অব ফুল'-এর কথা বলেছি—রণজিৎ একে চূড়ান্ত ব্যবহার করে মেলে ধরেছেন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো, কখনও 'সময়, সবুজ ডাইনি'র 'একটি প্রেমের কবিতা'য় ক্ষ্যাপা হরেনের মধ্যে দিয়ে, কখনও 'বন্দরের কথ্যভাষা'-র 'চৌরঙ্গি'-র মতো লেখায় 'খোকন, বাড়ি ফিরতে রাত করিস না বাবা'—এই 'উক্তি'-র বিস্ফোরণ-মাত্রায়।

সার্ভেন্তেসের দোনকিহোতে বা এমনকি যীশুর মতন কারো চোখ দিয়ে এই যে উন্মোচন, এই যে মেলে ধরা, একে অনুসরণ করতে করতে আমরা টের পাই এঙ্গেলস কাকে আসলে 'সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া' বলেছেন, সমস্যার কোন সমাধান ব্যতিরেকেই। এবং তার বিপরীতে রয়ে যায় আমাদের নিজেদের ডাঁই করা সমস্ত অভিজ্ঞতা; যাঁর মুখোমুখি, প্রায় যেন ডার্জের ভঙ্গিতেই, শব্দ চয়ন করে করে নিজের চারপাশকেই চিহ্নিত করে চলেন একজন রণজিৎ; এবং আমাদের, নিরুপায়, মনে পড়ে যায় ক্রুশ কাঁধে সেই যুবাকে যে হেঁটে আসছে পাহাড়-জঙ্গল-নদী-মাঠ পার হয়ে আমাদের, হাস্যকর হতে পারে—তবু বিবেকের উদ্দেশ্যে। এবং এই যে শব্দটি লিখলাম—'বিবেক', এর সঙ্গে প্রতিটি সংঘর্ষেই আমাদের কাছে নির্মিত হয় রণজিৎকে দেখার 'ধরন'—অর্থাৎ কীভাবে দেখব আমরা এই কবিকে, সেটা নির্দিষ্ট হতে থাকে। জীবনানন্দ বলেছিলেন "কবিতা (তার) নিজেকে—ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তাকে প্রকাশ করার একটা দিক—মহৎ দিক"[১৩]; এ তো আছেই, কিন্তু কবিতা তো পাঠক, যে-আমি পড়ছি ও-লেখা তারও সত্তাকে প্রকাশ করার, অন্তত নিজের কাছে প্রতিভাত হবার একটা উপায় বটে। এবং এই

প্রতিভাত হওয়া ব্যাপারটাই ওখানে আমরা টের পাই ঘটে যায়। রণজিতের রচনা কোথাও কোথাও আপাত-স্মার্টনেসে কৃত্রিম-উজ্জ্বল হলেও এ হয় দেখেছি, দেখতে পাই আমি। ওঁর লেখার মুখোমুখি, চোখে পড়ে উন্মোচিত হয়ে যেতে থাকে এই বাস্তববিশ্বের কৌণিক সমস্ত সম্পর্কের গভীরে নিহিত আরেক দিগন্ত যার মুখোমুখি না দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় না সেই আছড়ে পড়া স্পেসটিকে, যেখান থেকেই বোধহয় কেবল উচ্চারণ করা চলে 'প্রকৃত নিজের কাছে যাওয়া এক অকল্পনীয় অন্তর্ঘাত' (সুড়ঙ্গ : বন্দরের কথ্যভাষা), অথবা লিখে ফেলা যায় 'দ্রুত হাতে' 'কালো মেয়েটির জন্য প্রথম লিরিক।' এই এটাকে কী বলব আমি, কীভাবে চিহ্নিত করব, আমার জানা নেই। আমি কেবল টের পেতে পারি নির্মিত হয়ে চলেছে এঙ্গেলস কথিত ঐ 'সামাজিক সম্পর্কগুলোর নিখুঁত চিত্রায়ণ' যার স্পর্শে বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে আলোময় হয়ে যায় চতুর্দিক, অনুভব করা যায় 'জিপসীদের তাঁবু'-র ঐ কবিতা 'বাবাকে'-র ঐ 'পাওয়ার স্টেশন'-এর তাৎপর্য, তাৎপর্য এ-উচ্চারণের যে, 'আপনি আমার লেখার জগত থেকে একটু দূরে রয়েছেন' (ঐ লেখা : জিপসীদের তাঁবু)। একই সঙ্গে আমূল আক্রোশে, হিংস্রতায় আঘাত হানার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আর না-পারার মধ্যবিত্ত অসহায়তা—দুই-ই এইভাবে নির্মাণ করে চলে টের পাই, এই এক জলে ডুবে থাকা মাইন, রণজিতের কবিতা, আমার ধারণা যার সঙ্গে একদিন প্রকৃত পাঠকের সংযোগে সবকিছু উড়ে যাবে, যাবেই এবং তারপর —তারপর ফের পথচলা, বেরিয়ে পড়া, লরির পথে, মণিকা চ্যাটার্জিদের থেকে দূরে, তাঁদের 'চটুল কাঁচুলি ফাঁস' থেকে দূরে, বহু দূরে।

১. সামান্য একটি উদাহরণ, ধরা যাক 'জিপসীদের তাঁবু'-র 'বাবাকে' লেখাটি —যেখানে উনি উন্মুক্ত করছেন নিজের এবং সম্ভবত নিজের শ্রেণীর যাবতীয় অক্ষমতাকে, মাত্র একটি শব্দবন্ধের আবহে যে, 'পাওয়ার স্টেশন' (ঐ বই, পৃঃ ২০); এবং ঐ অক্ষমতার প্রতি ওর যে অ্যাটিচ্যুড, আমরা পরে দেখাব যে, কীভাবে এইটিই হয়ে উঠছে ওঁর 'কবিতা'।

২. কবিতা লেখার অজুহাতে : আমাদের লাজুক কবিতারা

৩. অনুপম : আমাদের লাজুক কবিতারা

৪. শহরতলি : জিপসীদের তাঁবু

৫. আপেল : জিপসীদের তাঁবু

৬. 'প্রকৃতপক্ষে দেশী এবং বিদেশী এই দুরকম মদই চেখে উঠতে পেরেছিলাম মাত্র—তার বেশি নয়, রণজিৎ লিখছেন ওঁর 'আমাদের লাজুক কবিতা'-র গদ্যাংশ 'কবিতা লেখার অজুহাতে'তে।

৭. কবিতা লেখার অজুহাতে ঃ আমাদের লাজুক কবিতা

৮. কবিতা লেখার অজুহাতে ঃ আমাদের লাজুক কবিতা

৯. মনে করে দেখুন ওঁর 'জিপসীদের তাঁবু'র ঐ কবিতাটি, মানে ১১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ঐ 'গলফ খেলা' বা ও-বইয়ের 'গ্যারেজ' কবিতাটির কথাও। বুঝতে খুব অসুবিধে বোধহয় হবে না এ-লেখাগুলি যদি রাখেন সামনে তাহলে, 'অ্যাটিচ্যুড' বলতে আসলে কী আমি বোঝাচ্ছি এখানে। বুঝতে অসুবিধে হবে না যদি পাঠক ভুলে না যান 'সময়, সবুজ ডাইনি'র 'শার্লক হোমস-এর ভারত-ভ্রমণ' বা 'গাছকে লেখা চিঠি'র মত লেখাগুলিকেও, যেখানে রণজিৎ যথাসম্ভব নিজেকে নিরাবরণ করতে চেয়েছেন; এ-জিনিস উনি উন্মাদ চিৎকারে জানাতে চেয়েছেন 'সময়, সবুজ ডাইনি'রই 'ডায়েরী থেকে'র অন্তর্বস্তুতেও, যা-কিনা বিধৃত রয়ে গেছে ঐ 'নিঃশব্দে কিছু একটা ভেঙ্গে পড়লো'র অমোঘ, হিম অভিজ্ঞতার সারাৎসারে।

১০. 'কবিতার কথা'র এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বলছেন 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে প্রচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' আমি কেবল বলতে চাই এটাই যে, ঐ যাকে জীবনানন্দ বললেন ইতিহাস-চেতনা ও প্রচ্ছন্ন কালজ্ঞান, এ-দুয়ের প্রকৃত মিশ্রণ যার জন্ম দিতে পারে তা ঐ অ্যাটিচ্যুডই; একে রাজনীতিবিদ একভাবে প্রকাশ করেন, দার্শনিক আরেকভাবে। কবির কাজও এই এখানেই পৌঁছতে চাওয়া—যাঁরা পারেন তাঁরাই কবি; 'কবি' কেন না, তাঁরা কোন ধারণা বা মতবাদকে প্রাক-কল্পনায় না নিয়েও নিজের নিজস্বতাকে কেবল নিজের অতীত এক চির-পদার্থে রূপ দিতে পেরেছেন—সে রূপ যেরকমই হোক।

১১. Marxist on literature : Ed. David Craig / Pelican Books p-268

১২. এইখানে কেবল 'ঔপন্যাসিক' শব্দের বদলে 'কবি' পড়তে হবে, নিশ্চয় টের পেয়ে গেছেন পাঠক!

১৩. এইখানে এই ( ) চিহ্নটি আমার।

Space donated by

A

Well Wisher

3 TARA SANKAR SARANI
CALCUTTA-37

With best compliments from :

M/s NARAYAN TRANSPORT CORPORATION

TRANSPORT CONTRACTORS & COAL HANDLING AGENTS

109, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001
PHONE Nos. : 38-5968 38-1806

অন্তরীপ

সম্পাদক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৫ খেলাত বাবু লেন টালাপার্ক কলকাতা ৩৭
মুদ্রক সোম প্রিণ্টার্স ৭ কানাইলাল চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭৬

দশ টাকা